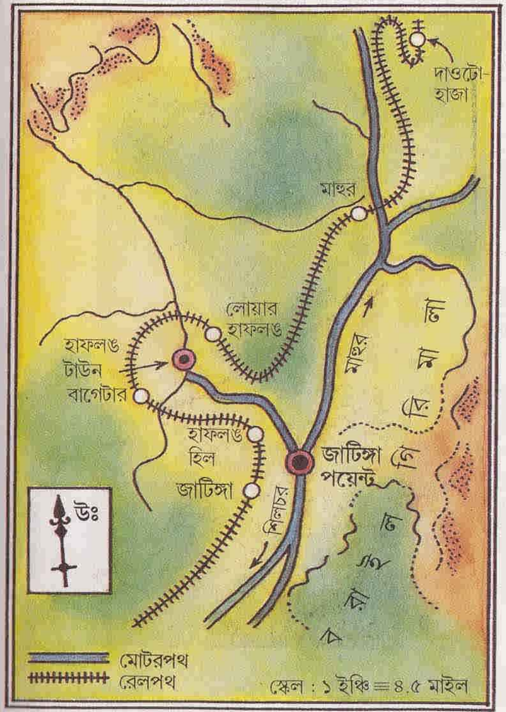
রহস্যময় পাখির দেশে

অনীশ দেব




দাওটো-
হাজা
মাহুর
লোয়ার
হাফলঙ
হাফলঙ
টাউন
বাগেটার
হাফলঙ
হিল
জাটিঙ্গা
জাটিঙ্গা
পয়েন্ট
মাহুর
শিলচর
উঃ
মোটরপথ
রেলপথ
স্কেল : ১ ইঞ্চি = ৪.৫ মাইল

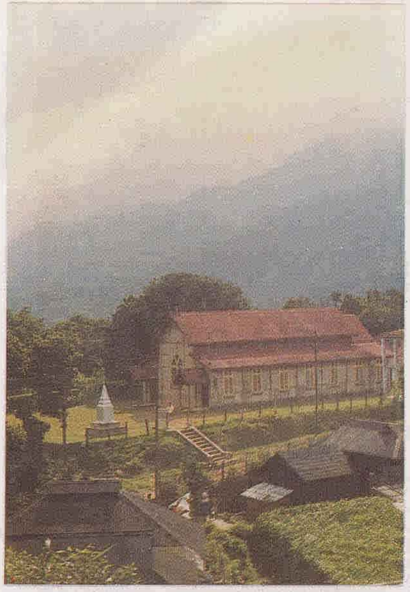
জাটিঙ্গার মানচিত্র।



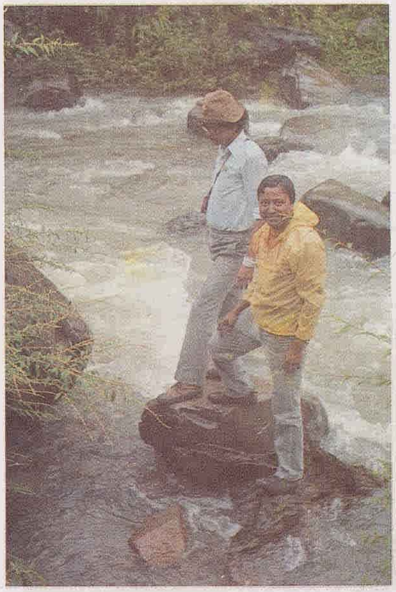
জাটিঙ্গার এক নম্বর বার্ড ওয়াচিং সেন্টার (স্থানীয় চলতি নাম বার্ড ওয়াচিং টাওয়ার)—আধুনিক সংস্করণ হওয়ার পরে।



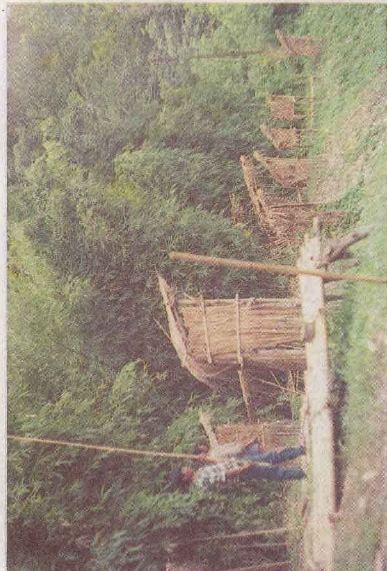
কুয়াশার ঢল নেমে আসছে জাটিঙ্গার গ্রামে।



জাটিঙ্গার প্রেসবিটারিয়ান চার্চ।



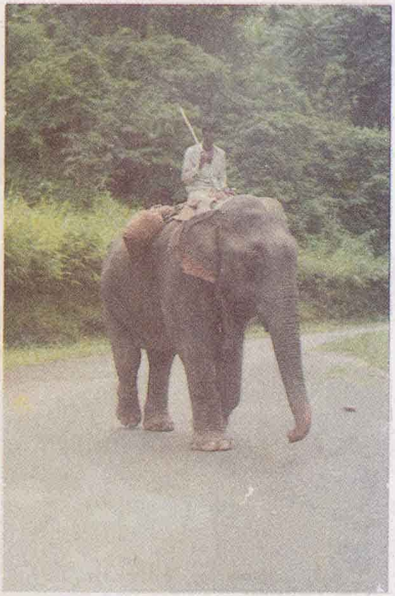
মাপজোখের ফাঁকে ডুলং নদীর তীরে কয়েক মুহূর্তের বিশ্রাম। হলদে জ্যাকেট পরে আমি, সঙ্গে ডক্টর গৌরীশঙ্কর ঘটক।



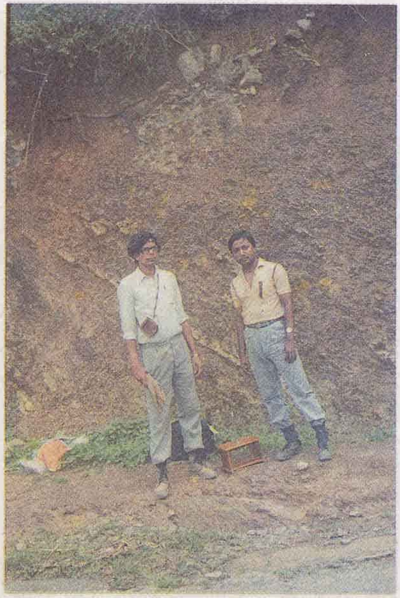
দু-নম্বর টাওয়ারের নীচে কবরখানায় পাখি শিকারীর দল। হাতে মুলি বাঁশের লাঠি। বাঁশের তৈরি ছোট ছোট খুপরি-ঘরগুলোতে ওরা হ্যাজাক জ্বেলে সারারাত বসে থাকে দিশেহারা পাখির আশায়।



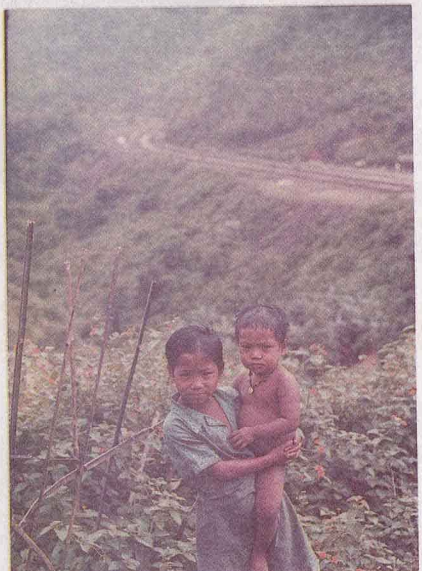
জাটিঙ্গার জঙ্গলে মাথায় সাহেবী হ্যাট পরে ডক্টর গৌরীশঙ্কর ঘটক। সঙ্গে একটি স্থানীয় ছেলে।



জাটিঙ্গা থেকে শিলচরের পথে হাতির সঙ্গে দেখা।



পাহাড়ী পথে মাপজোখের ব্যস্ততার ফাঁকে আমি (ডানদিকে) ও ডক্টর গৌরীশঙ্কর ঘটক।



জাটিঙ্গার রেল স্টেশনের কাছে ছোট বোনকে কোলে নিয়ে মণিপুরী বালিকা।

এই বই প্রসঙ্গে

জাটিঙ্গার পাখি-রহস্য নিয়ে পত্র-পত্রিকায় বেশ কিছু লেখালেখি হয়েছে। খবরও বেরিয়েছে নানা কাগজে। সেই থেকেই এ ব্যাপারটা নিয়ে আমার কৌতূহলের শুরু। অবশেষে যোগাযোগ করি জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার 'জাটিঙ্গা বার্ড প্রজেক্ট'-এর প্রাণিবিজ্ঞানী ডক্টর এস সেনগুপ্তের সঙ্গে। ১৯৮৫তে আমরা জাটিঙ্গায় যাই বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের কাজে। সেই হিসেবে এই লেখা জাটিঙ্গার প্রকৃতি, পরিবেশ, পাখি, মানুষ ও বিজ্ঞান নিয়ে অনুসন্ধানের বিবরণ।

জাটিঙ্গা আমি গিয়েছি দুবার। দ্বিতীয়বার ১৯৮৬ সালে। তখন আমাদের সঙ্গে ছিলেন তৃতীয় বিজ্ঞানী প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক ডক্টর গৌরীশঙ্কর ঘটক। যেহেতু এটা শুধুমাত্র প্রথম 'অভিযান' নিয়ে লেখা, তাই স্বাভাবিক-ভাবেই ডক্টর ঘটকের প্রসঙ্গ এতে অনুপস্থিত। তবে জাটিঙ্গা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোকপাতের ব্যাপারে তিনি কম সাহায্য করেননি। তাঁকে ধন্যবাদ জানাই।

দ্বিতীয়বার যখন আমরা তিনজনে জাটিঙ্গায় যাই তখন এক নম্বর বার্ড ওয়াচিং টাওয়ারের পুরনো ঘরের সামনে নতুন সুদৃশ্য বাংলো ধরনের টাওয়ার তৈরি হয়েছে—একটি দুই-বিছানার ঘরসমেত। বইয়ে এক নম্বর টাওয়ারের সেই আধুনিক সংস্করণের ছবিই দেওয়া হয়েছে।

এই বইয়ে আলোচিত পাখি-সংক্রান্ত ব্যাপারে সালিম আলি ও ডিলন রিপলি-র 'কমপ্যাক্ট হ্যান্ডবুক অফ দ্য বার্ডস অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান'-এর দ্বিতীয় সংস্করণটি ব্যবহার করেছি। এছাড়া সাহায্য করেছেন আমার প্রাণিবিজ্ঞানী বন্ধু শ্রীসমীর শীল। ধন্যবাদ দিয়ে তাঁকে ছোট করতে চাই না।

অনীশ দেব

ফলিত পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ
বিজ্ঞান কলেজ
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
কলকাতা - ৯

লেখকের অন্যান্য বই

উপন্যাস

সাপের চোখ
বাঘের নখ
ঘাসের শিষ নেই
সাক্ষী কেউ নেই
পিশাচপ্রহর
তীরবিদ্ধ
হীরা চুনি
কিরাত আসছে
মোনালিসার শেষ রাত
ক্ষুরধার খেলা
আঁধারপ্রিয়া
ছায়ার মতো মানুষ
বিশ্বাসঘাতকদের জন্য
পায়ের শব্দ নেই
গোলাপ বাগানে ঝড়
জীবন যখন ফুরিয়ে যায়

ছোটদের কল্পবিজ্ঞান

সবুজ পাথর
শিলাবৃষ্টির শরবত
ইন্সপেক্টর রনি

সম্পাদিত গ্রন্থ

সেরা কল্পবিজ্ঞান
সেরা কিশোর কল্পবিজ্ঞান
খুনের রং
(যুগ্ম সম্পাদক সমরেশ মজুমদার)
ভূতগুলো বড় ভয়ঙ্কর
(যুগ্ম সম্পাদক বিমল কর)
চার দশকের সেরা রহস্য-রোমাঞ্চ-গোয়েন্দা কাহিনী (যন্ত্রস্থ)

গল্প সঙ্কলন

অশরীরী অলৌকিক
ভূতনাথের ডায়েরি
কিশোর রহস্য রোমাঞ্চ
গোয়েন্দার নাম এসিজি
এক ইঞ্চির গরমিল

বিজ্ঞান গ্রন্থ

ধাঁধা-হেঁয়ালি খামখেয়ালি
ধাঁধার মজা, মজার ধাঁধা
বিজ্ঞানের হরেকরকম
বিজ্ঞানের দশদিগন্ত
ভিন গ্রহে কি প্রাণ আছে?
সায়েন্স পাজল ও অন্যান্য
জুল ভের্ন-এর স্বপ্ন
হাতে-কলমে কম্পিউটার ও বেসিক প্রোগ্রামিং
(সহলেখক প্রমথেশ দাস)
বিজ্ঞান যখন ভাবায় (সম্পাদনা সহযোগিতা)

অনুবাদ গ্রন্থ

রবিনসন ক্রুশো (সংক্ষিপ্ত)
ডঃ জেকিল অ্যান্ড মিঃ হাইড (সংক্ষিপ্ত)
নিয়তির শেষ ঠিকানা (জেমস হ্যাডলি চেজ)
হাতের মুঠোয় পৃথিবী (জেমস হ্যাডলি চেজ)
আলোছায়ার খেলা (আগাথা ক্রিস্টি)
পীকস্কিল (হাওয়ার্ড ফাস্ট)
বিশ্বের সেরা ভয়ঙ্কর ভূতের গল্প

এক

দেশটা সম্পর্কে ভাসা ভাসা কিছু কথা শুনেছিলাম আগে থেকেই।

অসমের কোন এক প্রান্তের এক পাহাড়ী গ্রাম। বছরের বিশেষ এক সময়ে অন্ধকার রাতে অসংখ্য পাখি উড়ে আসে সেখানে। এবং আগুন দেখলেই তারা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ দেয়। গ্রামের পাহাড়ী উপজাতিরা মরসুমের সময়ে রাতে আগুন জ্বেলে অপেক্ষা করে পাখির জন্য। পাখি এসে পড়লে তারা সেগুলো পুড়িয়ে নিজেদের খিদে মেটায়।

হাজার-হাজার পাখি রাতের অন্ধকারে উড়ে এসে আগুনে ঝাঁপ দেয়, এমনটা কখনও শোনা যায়নি। সারা পৃথিবীতে এ রকম কোনও নজির নেই। অথচ এই 'অলৌকিক' ঘটনাই ঘটে চলেছে ভারতের এক অকিঞ্চিৎকর গ্রামে—বছরের পর বছর ধরে।

পাঁচ-ছ'বছর আগে খবরের কাগজে এই অদ্ভুত ঘটনার উল্লেখ দেখেছিলাম। আকর্ষণীয় নানা শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছিল রঞ্জিত খবরগুলো। যেমন 'পাখির আত্মহত্যা', 'পাখিদের সহমরণ' ইত্যাদি। পাখিদের 'আত্মহত্যা' বা 'সহমরণের' বোধ নেই। কিন্তু এটুকু নিশ্চয়ই সত্যি যে, রাতে আলোর আকর্ষণে প্রচুর পাখি উড়ে আসে সেই গ্রামে। ঠিক শ্যামাপোকার মতো। এই ব্যাপারটাই অন্য অনেকের মতো আমাকেও ভীষণ কৌতূহলী করে তুলেছিল। আর সেই কৌতূহল থেকেই ১৯৮৫-র সেপ্টেম্বর মাসে জড়িয়ে পড়েছিলাম 'রহস্যময়' দেশ অভিযানে। অবশ্য একমাসব্যাপী এই অভিযানে আমার ভূমিকা ছিল ফলিত পদার্থবিজ্ঞানীর।

রহস্যময় দেশটির নাম জাটিঙ্গা। অসমের 'নর্থ কাছাড় হিল্‌স' জেলার একটি গ্রাম। অসমের দক্ষিণ অংশটি একটি পায়ের মতো সরু হয়ে নেমে গেছে নীচে। স্পর্শ করেছে মিজোরাম ও ত্রিপুরা। এই পায়ের পুবদিকে রয়েছে মণিপুর ও নাগাল্যান্ড, এবং পশ্চিমে বাংলাদেশ ও মেঘালয়। পক্ষিবিজ্ঞানের মানচিত্রে জাটিঙ্গা নিজের জায়গা করে নিলেও ভূগোলের মানচিত্রে সেই সম্মান এখনও সে আদায় করে উঠতে পারেনি। জাটিঙ্গার সবচেয়ে কাছাকাছি যে-নগরটি মানচিত্রে চিহ্নিত রয়েছে তার নাম

হাফলঙ। হাফলঙের অবস্থান অসমের পায়ের কাল্পনিক হাঁটুর সামান্য নীচে—সেখান থেকে পুবে মণিপুর আর পশ্চিমে মেঘালয় প্রায় সমান দূরত্বে। হাফলঙ নগরের দক্ষিণ-পূর্বে মোটামুটিভাবে দশ কিলোমিটার দূরত্বে অবস্থিত জাটিঙ্গা গ্রাম (25° 12′N 93°E)। গ্রামের অধিবাসী খাসিয়া উপজাতির মাত্র হাজারদেড়েক মানুষ।

জাটিঙ্গা গ্রামে রহস্যময়ভাবে পাখি উড়ে আসার ঘটনা অনেক পুরনো। সঠিক সময়ের হিসেব কেউ না দিতে পারলেও, ব্যাপারটি যে কমপক্ষে আশি বছরের পুরনো সে-ইতিহাস গ্রামবাসী খাসিয়াদের অনেকেই জানেন। জাটিঙ্গার আদি অধিবাসী ছিল 'জেমি নাগা' উপজাতির লোকেরা। নাগাদের মধ্যে পাঁচ-ছ'রকম শ্রেণী আছে। তারই একটি হল 'জেমি' নাগা। তারা এই পাহাড়ী গ্রামটির নাম দিয়েছিল 'জাটিঙ্গা'। যার অর্থ হল 'বর্ষা ও বাতাসের পথ'। গ্রামটির জলবায়ুর চরিত্র থেকেই তারা যে নামকরণটি করেছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। বৃষ্টি আর বাতাস ছিল জাটিঙ্গার প্রতিটি ঋতুর মূল উপকরণ। এখনকার আবহাওয়া সামান্য বদল হলেও তাতে পুরনো স্বভাবের স্পষ্ট ইশারা পাওয়া যায়।

প্রচলিত কিংবদন্তী থেকে জানা যায়, এক কুয়াশার রাতে হঠাৎই ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি উড়ে আসার ঘটনাটি প্রথম আবিষ্কার করে জেমি নাগারা। তারা চাষবাস করে নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করত। কিন্তু ক্রমে লক্ষ করল, পাহাড়ী ছাগল ও বুনো শুয়োরের দল রাতে এসে প্রায়ই তাদের ফসল খেয়ে যায়, নষ্ট করে যায়। নাগারা ঠিক করল রাত জেগে ফসল পাহারা দেবে। সুতরাং কাঠকুটো জ্বেলে সারা রাত তারা বসে থাকত খেতের কাছে—শুয়োর আর ছাগল তাড়াত। এমনই একদিন, ঘন কুয়াশার রাতে, আগুনের কুণ্ড ঘিরে বসে ছিল জেমি নাগারা। হঠাৎই তারা সভয়ে দেখল ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তাদের ওপরে, আগুনের ওপরে। নাগারা ভাবল, নিশ্চয়ই এ কোনও অপদেবতার কাণ্ড। ভয়ে ছুটে পালাল তারা। অশুভ শক্তির প্রভাব থেকে মুক্তি পেতে গ্রামের সমস্ত বাসিন্দা তাদের মোড়লের নেতৃত্বে পরদিনই জাটিঙ্গা ছেড়ে চলে গেল। আস্তানা গাড়ল গিয়ে জাটিঙ্গা ও হাফলঙের মাঝের একটি জায়গা বোরো হাফলঙে। তখন লাখোন্‌বঙ সুচ্যাঙ নামে জনৈক খাসিয়া নামমাত্র দামে নাগাদের কাছ থেকে 'অভিশপ্ত' গ্রামটি কিনে নেন এবং নিজের দেশ জয়ন্তিয়া পাহাড়ে ফিরে গিয়ে আত্মীয়-পরিজন ইত্যাদিদের সঙ্গে করে নিয়ে এসে নতুন বসতি স্থাপন

করেন জাটিঙ্গায়। ১৯০৫ সালে এইভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এখনকার খাসিয়া গ্রাম জাটিঙ্গা।

কিছুদিনের মধ্যেই খাসিয়ারা 'রহস্যময়' পাখির ব্যাপারটা টের পেয়েছিল। কথিত আছে, হারিয়ে যাওয়া মোষ খুঁজতে কুয়াশার রাতে মশাল নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল কয়েকজন গ্রামবাসী। এমন সময় মশালের আলোয় আকৃষ্ট হয়ে উড়ে আসে বেশ কিছু পাখি। খাসিয়ারা নাগাদের মতো ভয় পায়নি। তারা পাখিগুলোকে ধরে। পাখিগুলো শুভ না অশুভ এই নিয়ে কিছু তর্কবিতর্কও হয় নিজেদের মধ্যে। অবশেষে কয়েকজন সাহসী গ্রামবাসী পাখিগুলিকে মেরে খায়। যখন সকলে দেখল যে, তাদের কোনও অসুখ-বিসুখ বা ক্ষতি হল না, তখন একবাক্যে সবাই মেনে নিল যে, অন্ধকারে উড়ে আসা পাখির ঝাঁক ঈশ্বরের দান ছাড়া আর কিছুই নয়। তারপর থেকেই, অর্থাৎ ১৯০৫ সাল থেকেই, কুয়াশার রাতে অনুকূল আবহাওয়া হলে পাখির ঝাঁক আলোর আকর্ষণে উড়ে আসে জাটিঙ্গা গ্রামে, এবং সেগুলিকে ঈশ্বরের দান মনে করে অথবা খেলাচ্ছলে মেরে গ্রামবাসী খাসিয়াদের অনেকেই খিদে মেটায়।

প্রখ্যাত প্রকৃতিবিদ ই. পি. জি.-র বইয়ে জাটিঙ্গার 'আশ্চর্য' ঘটনার উল্লেখ আছে। উল্লেখ আছে ভারতীয় পক্ষিবিদ ডক্টর সালিম আলির লেখায়। সালিম আলি পঞ্চাশের দশকে একবার জাটিঙ্গায় গিয়েছিলেন পরিদর্শনে, কিন্তু আবহাওয়া অনুকূল না থাকায় 'রাতের পাখিদের' দেখা পাননি। জাটিঙ্গার ঘটনার এরকম উল্লেখ হয়তো করেছেন আরও কেউ কেউ, আগ্রহ অথবা কৌতূহলও প্রকাশ করেছেন অনেকে, কিন্তু সনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ১৯৭৭ সালের আগে কেউ লিপ্ত হননি। ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকে জাটিঙ্গার 'পাখি-রহস্য' নিয়ে প্রথম বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু করেন কেন্দ্রীয় সরকারের একটি সংস্থার পক্ষিবিজ্ঞানী ডক্টর এস. সেনগুপ্ত। জাটিঙ্গার পাখি নিয়ে গবেষণার কাজে ডক্টর সেনগুপ্ত এখনও বছরে দু-চারবার করে সেখানে ঘুরে আসেন।

জাটিঙ্গা গ্রামটির এলাকা খুব বেশি নয়। মাত্র চার-পাঁচ বর্গ কিলোমিটার। সমুদ্রতল থেকে আড়াই-তিন হাজার ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এই গ্রামটি দক্ষিণ-পূর্বে বরাইল গিরিমালা দিয়ে ঘেরা। বরাইল পাহাড়ের গড় উচ্চতা ২৫০০ থেকে ৩০০০ ফুট। তারই মধ্যে উল্লেখযোগ্য উচ্চতা মাউন্ট হেম্পিও-র। এই শৃঙ্গটি প্রায় ৫০০০ ফুট উঁচু। ইন্দো-বর্মা সীমান্তে যে

পর্বতশ্রেণী রয়েছে তারই একটি অংশ লুসাই পাহাড়। বরাইল গিরিমালা ক্রমে এই লুসাই পাহাড়ের সঙ্গে গিয়ে মিশেছে। বছরের সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে আবহাওয়ার কতকগুলি শর্ত পূরণ হলে রাতে আলোর আকর্ষণে জাটিঙ্গায় উড়ে আসে পাখির দল। আবহাওয়ার শর্তগুলি হল, অন্ধকার রাত—অমাবস্যা হলে আরও ভালো হয়, ঘন কুয়াশা, সুষম বাতাস এবং ঝিরঝির বৃষ্টি।

১৯৫০ সালের ১৫ আগস্ট এই অঞ্চলে আসাম-চিন সীমান্তের জাইয়ুল উপত্যকায় প্রবল ভূমিকম্প হয়েছিল। ভূমিকম্পের এপিসেন্টার বা অধিকেন্দ্র ছিল রিমায় (29°N 97°E)। জাটিঙ্গার গ্রামবাসীদের বক্তব্য অনুযায়ী ভূমিকম্পের আগে বৃষ্টি বা বাতাস যে-রকম ছিল, পরে তার ধরন-ধারণ অনেকটাই পালটে গেছে। কিন্তু তবুও অন্ধকার রাতে অনুকূল আবহাওয়ায় আলোর টানে পাখিরা উড়ে আসে। আলো বলতে বেশিরভাগ গ্রামবাসীই ব্যবহার করেন হ্যাজাক লণ্ঠন, যদিও কেউ কেউ অতিরিক্ত ক্ষমতার বৈদ্যুতিক বাতিও ব্যবহার করে থাকেন।

অনুকূল আবহাওয়ায় পাখির দল সব সময় সমান সংখ্যায় আসে না—তাতে হেরফের থাকে যথেষ্ট। তবে সাধারণত আবহাওয়া যত চরম দিকে এগোয় পাখির সংখ্যা ততই বাড়তে থাকে। উড়ে আসা পাখির ঝাঁক আলোর ওপরে বা আশেপাশে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর বসে থাকে চুপটি করে। যেন কেউ তাদের সম্মোহিত করে রেখেছে। উত্যক্ত না করলে তারা একইভাবে বসে থাকে ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত। আবার কোনও কোনও পাখি দিনের বেলাতেও 'সম্মোহনমুক্ত' হয় না। গ্রামবাসীদের অনেকে এই 'হতবুদ্ধি' পাখিগুলোকে পোষ মানানোর চেষ্টা করেছেন। তবে বেশিরভাগ পাখিই মারা গেছে অনশনে। কারণ মানুষের হাত থেকে কোনওরকম খাবারই তারা মুখে তোলে না। জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেও কোনও সুফল পাওয়া যায়নি। একটু পরেই পাখিরা সেই খাবার উগরে ফেলে দিয়েছে। কয়েকটি পাখির ক্ষেত্রে আরও আন্তরিক চেষ্টা গ্রামবাসীরা করেছিল। পাখিরা বনে-জঙ্গলে যে যে প্রাকৃতিক খাবার খায়, ঠিক সেই সেই খাবার—যেমন পোকামাকড়, ফল ইত্যাদি—জঙ্গল ঢুঁড়ে নিয়ে এসে তুলে দিয়েছিল পাখিদের ঠোঁটে। কিন্তু সেই খাবারও পাখিরা প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং অনিবার্যভাবে উপবাসে মারা গেছে। হয়তো এই

কারণেই 'আত্মহত্যা' শব্দটা জাটিঙ্গার পাখিদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে।

জাটিঙ্গার পাখি-রহস্যকে মোটামুটি তিনটে ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমত, রাতের বেলায় পাখিরা পাহাড়ে-জঙ্গলে ঘুমিয়ে থাকে। কোনও কারণে তারা চঞ্চল হয়ে ঘুম ছেড়ে উঠে পড়ে আকাশে এবং দিশেহারা হয়ে উড়তে থাকে। দ্বিতীয়ত, আলো দেখে তারা শ্যামাপোকার মতো আকৃষ্ট হয়। আর তৃতীয় এবং শেষতম রহস্য হল, শুধুমাত্র জাটিঙ্গা গ্রামেই তারা আলোর আকর্ষণে নেমে আসে। জাটিঙ্গার বাইরে তিরিশ-চল্লিশ ফুট দূরত্বে আলো জ্বেলে অপেক্ষা করে দেখা গেছে উল্লেখযোগ্যভাবে পাখি সেখানে আসেনি।

ঘুমের জায়গা ছেড়ে পাখিদের আকাশে উড়ে পড়ার কারণ হিসেবে ডক্টর সেনগুপ্ত তাঁর একটি গবেষণাপত্রে কয়েকটি প্রস্তাব রেখেছিলেন ঃ আবহাওয়ার বৈদ্যুতিক অবস্থা জাটিঙ্গা অঞ্চলের ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের ওপরে হয়তো প্রভাব ফেলে। এই প্রসঙ্গে, বছর কয়েক আগে মহারাষ্ট্রের কয়না বাঁধ ভেঙে পড়ার মতো ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন তিনি। বাঁধ দুর্ঘটনার পর বিশেষজ্ঞরা তদন্ত করে যে-ফলাফল পেয়েছিলেন তাতে জানা গেছে, সঞ্চিত জলের চৌম্বক ধর্মের পরিবর্তনই কয়না বাঁধ দুর্ঘটনার প্রধান কারণ। সুতরাং, কুয়াশা, বৃষ্টি ও ঝোড়ো হাওয়া জাটিঙ্গার চৌম্বক ক্ষেত্রের ওপর যে-প্রভাব ফেলে তা হয়তো পাখিদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের শৃঙ্খলা নষ্ট করে দেয়। ফলে পাখিরা ওই রকম 'বিচিত্র' আচরণ করে। জার্মান বিজ্ঞানী হার্টম্যান লক্ষ করেছিলেন, চরম বৈদ্যুতিক বিশৃঙ্খলাময় ঝড়ের দিনে পরিযায়ী কার্লিউ পাখির ঝাঁক মাপে সবচেয়ে বড় হয়।

এইসব উদাহরণ লক্ষ করেই ডক্টর সেনগুপ্ত ঠিক করেছিলেন, এবারের অভিযানে জাটিঙ্গা অঞ্চলের বিভিন্ন জায়গার ভূচৌম্বক ক্ষেত্র মেপে দেখবেন, এবং সেই কারণেই ফলিত পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে তাঁর সহযোগী হয়ে আমি রওনা হয়েছিলাম। সঙ্গে ছিল বিক্ষেপী ম্যাগনেটোমিটার, দোলনী ম্যাগনেটোমিটার, স্টপ ওয়াচ, দণ্ড চুম্বক, তড়িৎ-চুম্বক, রিওস্ট্যাট, অ্যামমিটার, ভোল্টমিটার ও আরও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি।

তড়িৎ-চুম্বকটি আমি নিজে পরিকল্পনা করে তৈরি করেছিলাম। উদ্দেশ্য ছিল সুস্থ এবং 'সম্মোহিত' পাখিদের তড়িৎ-চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রে রেখে চৌম্বক ক্ষেত্রের তীব্রতা বাড়িয়ে কমিয়ে তাদের প্রতিক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করব।

যথাসময়ে সে-পরীক্ষা করেছি এবং আশানুরূপ ফলাফলও পাওয়া গেছে।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে রওনা হওয়ার সময়ে একটা বিষয়ে খুব তীক্ষ্ণ নজর রেখেছি ঃ তুচ্ছতম জিনিসটিও যেন বাদ না পড়ে যায়। কারণ জাটিঙ্গার মতো গ্রামে, অথবা দশ কিলোমিটার দূরের হাফলঙ নগরে, প্রয়োজনীয় খুঁটিনাটি জিনিস পাওয়া যাবে কি না জানি না।

সঙ্গে প্রায় সত্তর কেজি লটবহর নিয়ে সেপ্টেম্বরের ১০ তারিখে আমরা দুজনে আকাশপথে রওনা হলাম গুয়াহাটি অভিমুখে। সত্তর কেজির মধ্যে শুধু তড়িৎ-চুম্বকটির ওজনই ছিল প্রায় ষোলো কেজি। মনে একটা ভয় ছিলঃ মালপত্র ওঠানো বা নামানোর সময়ে প্যাক করা যন্ত্রপাতিগুলোর যদি কোনও ক্ষতি হয়! শেষ পর্যন্ত যে সেরকম কোনও ক্ষতি হয়নি, তার প্রমাণ পেয়েছিলাম জাটিঙ্গায় পৌঁছে।

কলকাতা থেকে সোয়া বারোটায় উড়ে এয়ারবাস গুয়াহাটি বিমান বন্দরের মাটি স্পর্শ করল বেলা একটা নাগাদ। বিমানবন্দর থেকে ট্যাক্সি ধরে আমরা রওনা হলাম গুয়াহাটি রেল স্টেশনের দিকে। কারণ, সেখান থেকে ট্রেন ধরে বাকি পথ অতিক্রম করতে হবে। লক্ষ করলাম, বিমানবন্দরের ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে চাঁদার বিল কেটে ট্যাক্সি-চালকদের কাছ থেকে স্থানীয় বারোয়ারি বিশ্বকর্মা পুজোর চাঁদা আদায় করছে কিছু যুবক। বলা বাহুল্য, আমাদের ট্যাক্সিচালককেও এগারো টাকা চাঁদা দিতে হল। কলকাতায় বারোয়ারী বিশ্বকর্মা পুজো এখনও সেরকম ভাবে চালু হয়েছে বলে মনে হয় না। গুয়াহাটি সেদিক থেকে নিঃসন্দেহে এক ধাপ এগিয়ে রয়েছে।

গুয়াহাটি থেকে আমাদের গন্তব্য লোয়ার হাফলঙ। মাত্র দুটি ট্রেন আছে সেই পথে। একটি কাছাড় এক্সপ্রেস, অন্যটি বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেস। দুটিরই শেষ গন্তব্যস্থল শিলচর। পথে লোয়ার হাফলঙ ছুঁয়ে যায়। কাছাড় এক্সপ্রেস ছাড়ে বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ, আর বরাক ভ্যালি রাত দশটা কুড়িতে। স্টেশনে পৌঁছে সেদিনের কোনও টিকিট পেলাম না। পেলাম পরের দিনের বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেসে।

১১ তারিখ রাতে বরাক ভ্যালি এক্সপ্রেস চড়ে বসলাম। অতিরিক্ত লাগেজের জন্য একটু-আধটু যে অসুবিধে হয়নি তা নয়। তবে সেটা সামলে নিতে কোনও কষ্ট হয়নি। পরদিন সকাল ন'টা পনেরো নাগাদ আমাদের লোয়ার হাফলঙ পৌঁছোনোর কথা। কিন্তু সরু গেজের লাইন, পাহাড়ী রেলপথ ইত্যাদির কারণে ট্রেন লেট হওয়ার জন্য মনে মনে তৈরি ছিলাম।

প্রায় ঘণ্টাখানেক দেরিতে ট্রেন লোয়ার হাফলঙে পৌঁছে দিয়েছিল আমাদের। কিন্তু দেরি হওয়ার বিরক্তিটুকু ভুলিয়ে দিয়েছিল রেলপথের দু-পাশের দৃশ্য। সারা রাত ট্রেন পাহাড়ে চড়েছে। অতএব ভোরবেলা চোখ মেলতেই ছোট-বড় টিলা, সবুজ ঘন জঙ্গল, তারই ফাঁকে-ফোকরে পাহাড়ী ঝরনা নজরে পড়ল। কোথাও অনেক নীচে চোখে পড়ে হলুদ-সবুজ ধানখেত। তারই মাঝে কয়েকটা খড়ের-ছাউনি দেওয়া কুঁড়েঘর। খেতের কোল ঘেঁষে বয়ে চলেছে ঘোলা জলের পাহাড়ী নদী। এক কথায় অপূর্ব! ভ্রমণবিলাসী অধ্যুষিত আগমার্কা শৈলশহরে নিয়মমাফিক ভ্রমণ করেছি, কিন্তু যাত্রাপথের সৌন্দর্যে এই রেলপথ এখনও আমার প্রিয়তমা। এর পথের দু-পাশের দৃশ্য ঘোরতর রাগী মানুষকেও শান্ত করে দেবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

ট্রেন মাঝে মাঝে ঢুকে পড়ছিল অন্ধকার সুড়ঙ্গ-পথে। পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে ট্রেন চলার টানেল। কয়েকটা টানেল তো বেশ লম্বা। সে যাই হোক, চলার পথে কালাচাঁদ, মাইবঙ, দাওটোহাজা, মাহুর ইত্যাদি স্টেশন ছুঁয়ে শেষে পৌঁছলাম লোয়ার হাফলঙে। স্টেশন থেকে তিরিশ-চল্লিশ ধাপ সিঁড়ি উঠলে তবে পিচের রাস্তায় পৌঁছনো যায়। সেখানে জিপ পাওয়া গেল। স্থানীয় মানুষের কথায় 'ট্যাক্সি'। ট্যাক্সি বা জিপের অবস্থা শেরশাহের আমলের ক্যানেস্তারার মতো। তাতেই মালপত্র চাপিয়ে আমরা রওনা হলাম হাফলঙ ট্যুরিস্ট লজের দিকে। চড়াই আঁকাবাঁকা রাস্তা ধরে মিনিট কুড়ি চলার পরে এসে পৌঁছলাম হাফলঙ বাজারের কাছে। চারপাশে দোকানপাট, ঘরবাড়ি, অফিস, এমন কি একটা সিনেমা হলও চোখে পড়ল। বুঝলাম, নগর ক্রমে-ক্রমে শহরের চেহারা নিচ্ছে।

হাফলঙের প্রধান বাসিন্দা কাছারি উপজাতির লোকেরা, এছাড়া রয়েছে মিজো, নাগা, অসমীয়া ও বাঙালি। বাঙালিরা বেশিরভাগই ব্যবসায় জড়িত। তবে চাকুরিজীবীও আছেন। পরে কয়েকজন বাঙালি অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। তাঁরা দীর্ঘদিন ধরে হাফলঙে রয়েছেন। অধ্যাপনা করেন হাফলঙ কলেজে। কিন্তু তাঁদের কথায় কেমন একটা ব্যথা ও আশঙ্কার সুর টের পেলাম—গুয়াহাটিতে যা খুঁজে পাইনি।

হাফলঙের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য মুগ্ধ করার মতো। লোয়ার হাফলঙ স্টেশন থেকেই পাহাড় চোখে পড়েছে। কাছে, দূরে, স্পষ্ট ও ঝাপসা গাঢ় সবুজ রঙে রাঙানো শৈলশ্রেণী।

হাফলঙ বাজার থেকে ঢালু রাস্তা ধরে ট্যুরিস্ট লজের দিকে যাওয়ার

সময় সৌন্দর্য যেন আরও বেড়ে গেল। উঁচু-নিচু সবুজ মাঠ, রাস্তার কোল ঘেঁষে একদিকে হালকা নিচু জঙ্গল আর একদিকে সাজানো লেক। দূরে ঢেউ খেলানো পাহাড়ের মাথায় ঘন ছাইরঙা মেঘ। একটু জোরে বাতাস বইছিল। সামান্য শীত-শীত লাগলেও সময়টা যে শীতের নয় সেটা রাস্তার মানুষজনের পোশাক দেখেই বুঝতে পারছিলাম।

বাজার থেকে জিপে পাঁচ-সাত মিনিটের পথ পেরোতেই ট্যুরিস্ট লজে পৌঁছে গেলাম। পৌঁছেই খারাপ খবর শুনতে হল। থাকার জন্য কোনও ঘর খালি নেই। কারণ আগামীকাল, অর্থাৎ তেরো তারিখ থেকে চারদিনের জন্য ট্যুরিস্ট লজের সমস্ত ঘর বুক করা রয়েছে। জিজ্ঞেস করে জানা গেল 'অসমীয়া সাহিত্য সম্মেলন' জাতীয় কিছু একটা হবে চারদিন ধরে।

নর্থ কাছাড় হিল্‌স ডিস্ট্রিক্ট-এর শাসনভার রয়েছে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হাতে। শুধুমাত্র আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য রাজ্য আরক্ষাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে। সেই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল পরিচালিত একটি গেস্ট-হাউস রয়েছে হাফলঙে। ট্যুরিস্ট লজ থেকে কাছেই। শুনলাম, সেখানে একটি ঘর খালি আছে। অতএব টেলিফোন করে সেই ঘরটি দখল করার ব্যবস্থা হল।

ডক্টর সেনগুপ্তের গবেষণার কাজে সহকারী হিসেবে কয়েকজন রিসার্চ স্কলার রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন হাফলঙে নিযুক্ত, বাকিরা কলকাতায়। হাফলঙে সিনিয়ার রিসার্চ ফেলো হিসাবে যে রয়েছে তার নাম টিকেন্দ্র গোগোই। জোরহাটের ছেলে। জোরহাট কলেজে অধ্যাপনা করত, কিন্তু জাটিঙ্গার পাখি-রহস্য নিয়ে গবেষণার আগ্রহে স্থায়ী চাকরি ছেড়ে ডক্টর সেনগুপ্তের প্রকল্পে যুক্ত হয়েছে। গোগোইয়ের বাসস্থান এবং ফিল্ড ল্যাবরেটরির জন্য ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গেস্ট-হাউসের ছ' নম্বর ঘরটি ডক্টর সেনগুপ্ত তিন বছরের জন্য ভাড়া নিয়েছেন। প্রয়োজনীয় অনুমতি নিয়ে একটি বড়সড় পাখির খাঁচাও তৈরি করেছেন গেস্ট-হাউসের লনে। তাঁর নির্দেশে সারা বছর ধরে গোগোই জাটিঙ্গার পাখি নিয়ে গবেষণা করে, তৈরি করে ফিল্ড রিপোর্ট।

আমরা ট্যুরিস্ট লজে এসে উঠেছি খবর পেয়ে আধঘণ্টার মধ্যে গোগোই চলে এল আমাদের কাছে। লজে খাওয়া-দাওয়ার বাড়তি ব্যবস্থা না থাকায় রেল ভ্রমণের উদ্বৃত্ত খাবার দিয়েই মধ্যাহ্নভোজের কাজটুকু সেরে নিয়েছিলাম। ট্যুরিস্ট লজের বারান্দায় দাঁড়িয়ে লক্ষ করছিলাম দক্ষিণের মেঘ ক্রমেই আরও

ঘন হচ্ছে। ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে পুবের দিকে।

দক্ষিণের ঘন মেঘ দেখে ডক্টর সেনগুপ্ত ভীষণ অধৈর্য হয়ে উঠছিলেন। জাটিঙ্গা মোটামুটি দক্ষিণ দিকে। সুতরাং বারবারই তিনি বলছিলেন, 'আজ রাতে পাখি পড়বে—আজ রাতে পাখি পড়বে। আবহাওয়া ঠিক যেমনটি দরকার সেরকম হয়েছে। যেমন করে হোক আজ রাতে জাটিঙ্গা পৌঁছতেই হবে।'

এখন কৃষ্ণপক্ষ। আগামী পরশুদিন, চোদ্দ তারিখ, অমাবস্যা। ফলে আজ পাখি পড়ার সম্ভাবনা যথেষ্ট। সেই কারণেই ট্যুরিস্ট লজে ডক্টর সেনগুপ্তের মন একটি মুহূর্তও টিকছে না। উত্তরের বাদুলে-মেঘ তাঁকে যেন অলৌকিক হাতছানি দিয়ে ডাকছে। মন চঞ্চল হয়ে উঠেছে আমারও। কখন পৌঁছব জাটিঙ্গা, পা রাখব রহস্যময় পাখির দেশের মাটিতে। অতএব যন্ত্রপাতিগুলো আর হাতব্যাগ সঙ্গে রেখে বাকি মালপত্র গোগোইয়ের তত্ত্বাবধানে কুলির কাঁধে চাপিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হল গেস্ট হাউসে। আর আমরা দুজনে পায়ে হেঁটে রওনা হলাম কাছাকাছি ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসের দিকে।

ফরেস্ট অফিসে কথাবার্তা বলে জানা গেল, জাটিঙ্গায় থাকার মতো কোনও ব্যবস্থা তাঁদের নেই। তবে 'বার্ড ওয়াচিং টাওয়ার, মিউজিয়াম কাম লাইব্রেরি' বলে একটা জায়গা আছে—যেটাকে চলতি কথায় বলা হয় 'এক নম্বর টাওয়ার।' সেখানে এখন নতুন কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, কিন্তু কষ্ট করে মাথা গোঁজার ঠাঁই হলেও হতে পারে। 'আপনারা সে-কষ্ট সইতে পারবেন কি?'

পারব মানে! অভিযানে বেরিয়ে আবার আরামের চিন্তা! আমরা তো এক কথায় রাজি। তখন ডক্টর সেনগুপ্ত তাঁর পরিচিত এক খাসিয়া যুবকের খোঁজ করলেন। যুবকের নাম আকোস্তা ধর—ফরেস্ট অফিসেরই কর্মচারী। নিবাস জাটিঙ্গায়। ১৯৭৭-৭৮ সাল থেকেই সে ডক্টর সেনগুপ্তকে এত ভাবে সাহায্য করেছে যে, আর বলার নয়। তাঁর মুখে আকোস্তা সম্পর্কে বহু প্রশংসা শুনেছি। এখন সামনে এসে দাঁড়াতেই তাকে দেখলাম। পরিচয় হল। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'আকোস্তা, আজ রাতেই জাটিঙ্গা যেতে চাই। একটা জিপের ব্যবস্থা করে দাও।'

ফরসা সুন্দর মুখ আর পান-খাওয়া ঠোঁটে এক গাল হেসে ভাঙা বাংলায় আকোস্তা বলল, 'কোনও চিন্তা করবেন না, সার। আপনে ট্যুরিস্ট লজে

যান, আমি ছয়টার সময় জিপ নিয়া যাইতাছি।'

সুতরাং ট্যুরিস্ট লজে ফিরে এসে আমরা মেঘের দিকে চেয়ে আকোস্তা ও জিপের অপেক্ষায় রইলাম।

সোয়া চারটে নাগাদ বৃষ্টি এল। একদিকে ঘন কুয়াশা ও কালো মেঘ, আবার দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গাঢ় সাদা মেঘের স্তূপ—এমন কি একটুকরো নীল আকাশও দেখা যাচ্ছে না।

ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'এখানকার ওয়েদার ভীষণ আনপ্রেডিক্টেবল। তবে এখনও পর্যন্ত যা অবস্থা দেখছি তাতে আজ রাতে বার্ড-ফল শিওর।' তাঁর কাছেই শুনেছি, আদর্শ আবহাওয়ায় জাটিঙ্গায় পাখির ঝাঁক যখন আলোর টানে নেমে আসে তখন মনে হয় যেন পাখি বৃষ্টি হচ্ছে। সেই জন্যেই এই ঘটনাকে সকলে বলে 'বার্ড-ফল' অথবা 'পাখি পড়া'।

বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাজ পড়ছে। বৃষ্টি কখনও মুষলধারে, কখনও বা টাপুর-টুপুর। ডক্টর সেনগুপ্ত একটা ফিল্ড কম্পাস এনে বারান্দার রেলিঙে বসালেন। কম্পাসের কাঁটা উত্তরমুখী হয়ে স্থির। মাঝে মাঝে ফিল্ড বাইনোকুলার চোখে দিয়ে আকাশের অবস্থা দেখছি। লক্ষ করছি কুয়াশা ও মেঘের স্রোতের গতি-প্রকৃতি।

হঠাৎই কম্পাসের কাঁটা পলকের জন্য তিরতির করে কেঁপে উঠল। আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে সেই কাঁপুনি লক্ষ করতে লাগলাম। একটু পরেই কাঁটা আবার স্থির। আচমকা কাঁপুনির কারণটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলাম না। জানি না, বাদল মেঘের স্থিরতড়িৎ আধানের সহসা বিদ্যুৎ মোক্ষণ এর জন্য দায়ী কি না।

সাড়ে পাঁচটায় বৃষ্টি একেবারে থেমে গেল। জোলো মেঘগুলি সরে গিয়ে আকাশে শুধু পড়ে রইল কয়েক টুকরো ছেঁড়া মেঘ। আর তখনই অপূর্ব সূর্যাস্ত আমাদের মুগ্ধ করে দিল। বৃষ্টি ধোওয়া পশ্চিম আকাশে সূর্যের সাত রঙের খেলা কিছুক্ষণের জন্য ভুলিয়ে দিল কী কাজে আমরা হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি।

অন্ধকার গাঢ় হল। ঘড়ির কাঁটা ছ'য়ের ঘর পেরিয়ে গেল। আকোস্তা বা জিপের দেখা নেই। দুশ্চিন্তা ক্রমশ বাড়ছিল। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'আকোস্তা সাধারণত কথার খেলাপ করে না। ও জিপের ব্যবস্থা করে আসবেই।' কিন্তু যখন প্রায় সাড়ে ছ'টা বাজে তখন আমরা ঠিক করলাম, না, আর নয়। সমস্ত যন্ত্রপাতিগুলো ট্যুরিস্ট লজের অফিসে জিম্মা করে

আমরা দুজনে হাত-ব্যাগ নিয়ে অন্ধকার রাস্তা ধরে রওনা হলাম গেস্ট-হাউসের দিকে।

একটু এগোতেই গোগোইয়ের সঙ্গে দেখা। টর্চ হাতে ও ফিরে এসেছে আমাদের খবর নিতে। ওকে ব্যাপার-স্যাপার জানিয়ে তিনজনেই এগোলাম গেস্ট-হাউসের পথে।

হঠাৎ দেখি মুখোমুখি ছুটে আসা এক জোড়া হেডলাইট আমাদের পাশ কাটিয়ে কিছুটা গিয়ে থমকে দাঁড়াল। কেউ যেন ডাকল। কাছে গিয়ে দেখি আকোস্তা বসে আছে একটা জিপে। ও ডক্টর সেনগুপ্তকে দেখে হেসে বলল, 'ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে একটু দেরি হইয়া গেল, সার। ওঠেন, চলেন জাটিঙ্গা—।'

হাফলঙে ফুটবল খুব জনপ্রিয়। এখানে মরসুমের সময়ে নিয়মিত ফুটবল খেলা হয়। বাইরে থেকে, এমন কি কলকাতা থেকেও, দল আসে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে।

অতএব গোগোইকে তার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিলেন ডক্টর সেনগুপ্ত। ও চলে গেল গেস্ট-হাউসে। আর আমরা জিপে চড়ে সোজা ট্যুরিস্ট লজে। সেখানে যন্ত্রপাতির লটবহর টেনে তুলে নিয়ে জিপ ঘুরিয়ে রওনা হলাম জাটিঙ্গা। গন্তব্য—এক নম্বর টাওয়ার।

সকালে হাফলঙ বাজার পেরিয়ে ফাঁকা জায়গায় আসতেই কানে এসেছিল এক অদ্ভুত কান্না। ঠিক বাঁশিতে ফুঁ দেওয়ার মতো মিহি অথচ তীব্র শব্দ। টেলিগ্রাফের তারে তীব্র গতিবেগের বাতাস ধাক্কা খেয়ে তৈরি হয় কতকগুলি ভোরটেক্স বা ঘূর্ণি। যার পরিণতি হাইড্রোডায়ানামিক ফিডব্যাক। তা থেকেই শেষ পর্যন্ত তৈরি হয় এই বিচিত্র শব্দ। এর রহস্য ভেদ করেছিলেন প্রখ্যাত ব্রিটিশ পদার্থবিদ লর্ড র‍্যালে।

এখন ঘুটঘুটে অন্ধকারে জাটিঙ্গা যাওয়ার পথে নতুন এক শব্দ কানে এল, পতঙ্গের কান্না। শুধু কান্না বললে ব্যাপারটা ঠিক বোঝানো যাবে না। কটকট, করকর ইত্যাদি নানা বিচিত্র সুরের সম্মিলিত কান-ফাটানো চিৎকার।

সাপের মতো আঁকাবাঁকা রাস্তায় জোড়া হেডলাইটের আলো পথ দেখিয়ে ছুটে চলেছে। ক্ষণেকের জন্য চোখে পড়ছে পাহাড়ের দেওয়াল, খাদ, গাছপালা, ঝোপঝাড় আর পাথরের টুকরো। আকাশ মেঘে ঢেকে গেছে আবার। চাঁদ, তারা কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অভিজ্ঞ অভ্যস্ত হাতে জিপ

ছুটিয়ে চলেছে তরুণ খাসিয়া চালক। যতটুকু আন্দাজ করতে পারছি রাস্তার বেশিরভাগটাই উৎরাই—হাফলঙের থেকে জাটিঙ্গা সম্ভবত সামান্য নীচে।

আধাআধি রাস্তা পেরিয়ে আসার পরই একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ করলাম। কুয়াশা ছড়িয়ে রয়েছে আবহাওয়ায়। খুব ঘন না হলেও মোটামুটি গাঢ় কুয়াশা। অথচ একটু আগেও এরকম কোনও আভাস পাওয়া যায়নি। অতএব জিপ সতর্কভাবে চলতে লাগল।

হঠাৎই আমাদের হেডলাইটের আলো রাস্তার বাঁকে একপাশে দাঁড়ানো একটা সাদা মূর্তিকে ছুঁয়ে গেল। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'এই জাটিঙ্গা শুরু হল। ওই যে মূর্তিটা দেখলেন, ওটা গ্রাম যে প্রতিষ্ঠা করেছিল তার মূর্তি—ইউ. এল. সুচ্যাঙ।'

প্রতিষ্ঠাতার মূর্তিকে খুব কাছ থেকে দেখার সুযোগ পরে বহুবার হয়েছে।

গন্তব্যে পৌঁছে জিপ থেকে যখন নামলাম তখন টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে—সঙ্গে কুয়াশা তো আছেই! তাড়াহুড়োতে টর্চ আনা হয়নি—অন্য মালপত্রের সঙ্গে গেস্ট-হাউসে চলে গেছে। অতএব অন্ধকারের মধ্যেই আকোস্তাকে অনুসরণ করলাম।

রাস্তা থেকেই সিঁড়ি উঠে গেছে ওপরে। তার দু-পাশের ঘন ঝোপ থেকে ভেসে আসছে পতঙ্গের কান্না।

আকোস্তা সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল।

পাহাড় কেটে তৈরি হয়েছে সিঁড়ির অনেকটা। আকোস্তা গাঢ় অন্ধকারের মধ্যেও দিব্যি সাবলীলভাবে এগিয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে পিছন ফিরে আমাদের সতর্ক করে দিচ্ছে।

কিছুটা ওঠার পরই সিমেন্টের ধাপ শেষ হয়ে মাটি-পাথরের চড়াই। বৃষ্টিতে ভিজে পথ বেশ পিছল। তাই অত্যন্ত সাবধানে উঠতে লাগলাম আমরা।

প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ ফুট ওঠার পরে এক নম্বর টাওয়ারে পৌঁছলাম। টাওয়ারে মোট দুটি ঘর। সাহেবি ঢঙের শার্সি লাগানো পলকা সাদা দরজা। তবে শার্সির প্রায় সব ক'টা কাচই ভাঙা। ভাঙা জায়গায় আঠা দিয়ে সাদা কাগজ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে। দরজা দুটোর সামনে চার ফুট বাই চার ফুট একটুকরো সিমেন্ট বাঁধানো উঠোন বা বারান্দা। বারান্দার থামে ওয়াচ টাওয়ারের সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে।

টাওয়ারের সামনে আরও দুজন যুবককে দেখতে পেলাম। একজনের

নাম টমাস, আর একজনের নাম পহেলো। দুজনেই বনবিভাগে কাজ করে। আকোস্তার মতো পহেলোর কথাও ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে অনেকবার শুনেছি। টমাস ছেলেটি সে তুলনায় নতুন। টাওয়ারে পৌঁছনোর কিছুটা আগে রাস্তায় জিপটা দাঁড় করিয়েছিল আকোস্তা। তারপর ওপর দিকে মুখ তুলে 'টমাস' নাম ধরে বারকয়েক ডেকেছিল। উত্তরে পাহাড়ের ওপরের অন্ধকার থেকে কেউ জবাব দিয়েছিল। তারপর দুজনে চিৎকার করে খাসিয়া ভাষায় দু-চারটে কথা বলার পর জিপ আবার চলতে শুরু করেছিল। কারণ তখন বুঝিনি।

বুঝলাম এখন। টমাসের হাতে টর্চ আর চাবির গোছা দেখে। আরও বুঝলাম, পাহাড়ী পথ ধরে টাওয়ারে আসার সময়ে পহেলোকে সে ঘর থেকে ডেকে নিয়েছে।

চাবি দিয়ে সামনের ঘরটার তালা খুলল টমাস। পহেলো ঘর ও বারান্দার আলো জ্বেলে দিল। ভোল্টেজ খুব কম থাকায় বৈদ্যুতিক বাতি হ্যারিকেনের আলোর মতো টিমটিম করে জ্বলতে লাগল। আলো জ্বেলে আমাদের বসতে বলে ওরা তিনজন নীচে গেল জিপ থেকে আমাদের মালপত্রগুলো নিয়ে আসতে।

যে-ঘরে পা দিলাম সেটাই আমাদের একমাসের বাসস্থান ছিল। অতএব তার কিঞ্চিৎ বিশদ বর্ণনার প্রয়োজন আছে।

ঘরের মাপ অনুমানিক দশ ফুট বাই বারো ফুট। পুব দিকে লোহার গরাদে দেওয়া দুটি বড় বড় জানালা। আর উত্তর-দক্ষিণে দুটো একইরকম দরজা। উত্তরের দরজা—যেটা দিয়ে আমরা ঢুকেছি—বলতে গেলে সদর দরজা, আর দক্ষিণেরটি খিড়কি। ঘরের সিলিং মেসনাইট বোর্ডের, অবশ্য তার ওপরে টিনের চালের ছাউনি রয়েছে। মেঝের সিমেন্ট বেশ অমসৃণ, আর প্লাস্টার করা দেওয়ালের রঙ গোলাপী। দু-দিকের দুই দেওয়ালে ব্র্যাকেট লাগানো দুটি বৈদ্যুতিক বাল্‌ব। এছাড়া দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে রয়েছে একটি নীল রঙের নাইট-ল্যাম্প।

ঘরে আসবাবপত্রও প্রচুর। ঢুকেই ডানদিকের দেওয়াল ঘেঁষে রয়েছে পাঁচ বাই তিন বাই আড়াই ফুট মাপের একটি প্রকাণ্ড কাঠের বাক্স। তালা দেওয়া। পরে জেনেছি তার ভেতরে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের কিছু যন্ত্রপাতি রয়েছে। বাক্সের পিছনে এক কোণে রয়েছে একটি ছোট্ট জলচৌকি মাপের টেবিল। তার ওপরে দাঁড় করানো রয়েছে দুটি খালি বোতল—বোধহয়

পানীয় জল সঞ্চয় করে রাখার জন্য। এছাড়া জানলার দিকে রয়েছে বিশাল মাপের দুটি টেবিল। একটি আয়তাকার—ওয়ার্ক টেব্‌ল ধাঁচের শক্তপোক্ত গড়ন। আর অন্যটি ল্যামিনেটেড প্লাস্টিকে মোড়া ডিম্বাকৃতি। কনফারেন্স টেব্‌ল্‌ বা ডাইনিং টেব্‌ল্‌ হিসেবে সহজেই ব্যবহার করা যেতে পারে। ডিম্বাকৃতি টেবিলকে ঘিরে গোটা দশেক ফ্যাশনদুরস্ত হালকা চেয়ারও রয়েছে। তার পাশ ঘেঁষে দক্ষিণের দেওয়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি বুক কেস। বুক কেসের ওপরের দুটি তাকে বেশ কয়েকটা ইংরেজি বই চোখে পড়ল। বাকি তিনটে তাক খালি। বুক কেসটিকে দু-ভাগ করে ওপরে-নীচে স্লাইডিং গ্লাস প্যানেল লাগানো রয়েছে। নীচের অংশটি খালি থাকায় সেটিকে আমরা অস্থায়ী পাখির খাঁচা হিসেবে পরে ব্যবহার করেছিলাম।

যন্ত্রপাতি নিয়ে ওরা ফিরে আসতেই আমি প্যাকিং খোলার কাজে লেগে পড়লাম। কিছু মালপত্র রাখতে হল পাশের ঘরে। সে-ঘরে মেঝেতে একটা পুরনো কার্পেট বিছিয়ে প্রায় আট-দশজন মানুষ ঘুমিয়েছিল। এছাড়া ঘরের একপাশে কোদাল, শাবল, সিমেন্টের বস্তা, লোহার রড, দড়ির বাণ্ডিল সব টাল হয়ে পড়ে আছে। আকোস্তার কাছে শুনলাম আমাদের টাওয়ারের গা ঘেঁষে নতুন উঁচু আর-একটা টাওয়ার তৈরির কাজ চলছে। সেই কনস্ট্রাকশনের কাজে যে-সব রাজমিস্ত্রিরা এসেছে তারাই থাকে পাশের ওই ঘরটিতে। সারা দিন খাটুনির পর এখন খেয়ে-দেয়ে শুয়ে পড়েছে।

বারান্দায় একটা বাল্‌ব টিমটিম করে জ্বলছিল। পাখি আকাশে দিশেহারা হয়ে উড়লেও ওই আলোয় আকর্ষিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। অতএব কোত্থেকে একটা পাঁচশো ওয়াটের ফোকাস আর জেনারেটারের ব্যবস্থা করে বারান্দায় একেবারে সার্চলাইট জ্বেলে দিল আকোস্তা ও পহেলা। শুনলাম, মরসুমের সময়ে পাখিদের আকর্ষণ করার জন্যই ওই ফোকাস ও জেনারেটারের ব্যবস্থা। তবে আলোর টানে অসংখ্য পোকামাকড়-মথ-প্রজাপতিও এসে ওড়াউড়ি শুরু করে দিল বারান্দায়।

ঘরে টেবিলের ওপরে কম্পাস বসিয়ে দিয়েছেন ডক্টর সেনগুপ্ত, আর আমি প্যাকিং খুলে বের করে ফেলেছি বিক্ষেপী ম্যাগনেটোমিটার ও দোলনী ম্যাগনেটোমিটার—তার সঙ্গে একজোড়া দণ্ড চুম্বক ও স্টপ ওয়াচ। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের কাজ শুরু হয়ে গেল তৎক্ষণাৎ। ডক্টর সেনগুপ্ত আকোস্তাকে বললেন যা হোক কিছু রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে। ও চলে গেল। টমাস অবাক চোখে আমাদের কার্যকলাপ দেখছিল। আর পহেলা বাইরের

বারান্দায় সার্চলাইটের পাশে পাখির অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে।

একটু পরেই, রাত ঠিক ন'টার সময়, পহেলা হঠাৎ ডেকে উঠল 'সাব, জলদি আইয়ে—চিড়িয়া!'

চিড়িয়া, অর্থাৎ পাখি! পাখি এসেছে আলোর আকর্ষণে! আমরা দুজনেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা ফেলে চটপট চলে এলাম বাইরে। এসে দেখি একটা থ্রি-টোড কিংফিশার বসে আছে সার্চলাইটের একেবারে কাছে। উত্তেজনা ও আনন্দে আমার বুকের ধুকপুকুনি যে কয়েকগুণ বেড়ে গিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ডক্টর সেনগুপ্ত তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় অনেকবারই জাটিঙ্গার এই 'আশ্চর্য ঘটনা' দেখেছেন, সুতরাং তাঁর বিজ্ঞানী মন ঠিকঠাক কাজ করছিল। কিন্তু আমি এ ঘটনা দেখছি জীবনে প্রথম। অতএব সব কাজ ভুলে ছোট্ট রঙিন পাখিটাকে দু-চোখ ভরে দেখতে লাগলাম।

পাশের ঘর থেকে টমাস দুটো নীল রঙের স্টিলের চেয়ার টেনে এনে ছোট বারান্দায় পাশাপাশি পেতে দিয়েছিল। দুজনে সেই চেয়ারে বসে পাখিটাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। যে-তারের মাধ্যমে টাওয়ারে ইলেকট্রিক লাইন এসেছে, সেই তারের ওপরে চুপটি করে বসে আছে পাখিটা।

থ্রি-টোড কিংফিশার বা তিন-আঙুলে মাছরাঙা (বৈজ্ঞানিক নাম : *Ceyx erithacus*)। মাপে চড়ুই পাখির মতো। বসে থাকা অবস্থায় লেজ থেকে মাথা পর্যন্ত দৈর্ঘ্য মোটামুটি ছ'সাত সেন্টিমিটার। যদিও লেজ বললাম, আসলে পাখিটার লেজ প্রায় নেই বললেই চলে। প্রবালের মতো টুকটুকে লাল চঞ্চু। চঞ্চুর দৈর্ঘ্য প্রায় শরীরের দৈর্ঘ্যের সমান। গায়ে অনেকরকম উজ্জ্বল রং ঃ লাল, গাঢ় কমলা, হলুদ, নীলচে বেগুনি। আর পায়ের রঙও চঞ্চুর মতোই। পায়ে লাল টুকটুকে তিনটে আঙুল—দুটো সামনে, একটা পিছনে। তাই থেকেই থ্রি-টোড কিংফিশার নাম। দেখা যায় নানা জায়গায় ঃ উত্তরবঙ্গ, নেপাল, আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর থেকে শুরু করে তামিলনাড়ু ও কেরালা পর্যন্ত। বর্ষাকালে আবহাওয়া বুঝে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দিকে। সাধারণত পাহাড়ের পাদদেশ থেকে হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত পাওয়া যায়। গভীর জঙ্গলে ঝরনা বা জলাশয়ের কাছে পাথর কিংবা কোনও খুঁটির ওপরে চুপটি করে বসে থাকে। তাক বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে ছোট ছোট মাছ আর জলের পোকামাকড় খায়। আর লোক দেখলেই এক পলকে উড়ে যায় বুলেটের মতো। প্রায়ই খবর পাওয়া যায়, বাড়ির

দেওয়ালে অথবা কাচের জানলায় ধাক্কা খেয়ে মারা গেছে।

'এদের ছোট মাপ দেখে বাচ্চা পাখি ভাবার কোনও কারণ নেই।' আমার প্রশ্নের উত্তরে ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'এদের জাতটাই মাপে ছোট।'

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু পাখিটার যেন কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। চোখে শূন্য দৃষ্টি নিয়ে বসে আছে। আর হাঁপানির টানের মতো হেঁচকি তুলছে বারবার। এদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি যখন মাছ খুঁজে বেড়ায়, এদিক ওদিক তাকায়, তখন নাকি এরকম মাথা ওঠা-নামা করিয়ে হেঁচকি তোলার ভঙ্গি করে। ডক্টর সেনগুপ্ত স্টপ ওয়াচ নিয়ে পাখিটার আচার-আচরণ খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করছিলেন। সে-কাজ শেষ হতেই তিনি পহেলাকে বললেন পাখিটা ধরতে। কিন্তু সে-চেষ্টা ব্যর্থ হল। পহেলা হাত বাড়িয়ে ধরার চেষ্টা করতেই পাখিটা ফুড়ুৎ করে উড়ে গেল অন্ধকার কুয়াশার গভীরে। হয়তো জাটিঙ্গার অন্য কোথাও আলোর আকর্ষণে গিয়ে পড়বে। পাখিটা প্রায় কুড়ি মিনিট ছিল আমাদের কাছে।

প্রথম রাতেই এ ভাবে পাখির দেখা পাব ভাবিনি। ভাগ্যিস আকোস্তা জিপের ব্যবস্থা করতে পেরেছিল! প্রচণ্ড উৎসাহে ম্যাগনেটোমিটার বারান্দায় নিয়ে এসে মাপজোখের কাজ শুরু করলাম। স্পিরিট লেভেল দিয়ে যন্ত্র অনুভূমিক করাটাই দেখলাম সবচেয়ে কঠিন কাজ। অসমতল এবড়োখেবড়ো ঢালু মেঝেতে যন্ত্র অনুভূমিক করতে না পেরে পহেলার এগিয়ে দেওয়া একটা নড়বড়ে খাটো বেঞ্চির সাহায্য নিলাম। তার ওপরে যন্ত্র রেখে প্যাকিং-এর কাগজ, পিচবোড আর তুলো গুঁজে অনেক কষ্টে অনুভূমিক করলাম। তারপর পরীক্ষা-পর্যবেক্ষণ চালালাম রাত বারোটা পর্যন্ত। এক-দেড় ঘণ্টার পরীক্ষায় বেশ কিছু এলোমেলো পাঠ পেয়েছি। পরীক্ষা চলাকালীন ডক্টর সেনগুপ্ত মাঝে মাঝেই আবহাওয়ার অবস্থা লিখে নিচ্ছিলেন তাঁর ছোট্ট ফিল্ড নোটবুকে। একসময়ে পরীক্ষা শেষ হলে যন্ত্রপাতি ঘরে ঢুকিয়ে রাখলাম।

আকোস্তা খবরের কাগজে মুড়ে রাতের খাবার দিয়ে গিয়েছিল। খুলে দেখি পাঁউরুটি, ডিমসেদ্ধ আর কলা। সঙ্গে বিস্কুটও ছিল। তাই দিয়ে 'ডিনার' সেরে দুজনে বেরিয়ে পড়লাম টাওয়ার ছেড়ে। সঙ্গে চলল টর্চ-হাতে টমাস, আকোস্তা ও পহেলা।

কুয়াশা ও টিপটিপ বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় নেমে হেঁটে প্রায় আধ কিলোমিটার দূরে চলে গেলাম। যেখানে গিয়ে থামলাম, সেটা একটা তিন রাস্তার মোড়—মোটামুটিভাবে জাটিঙ্গা গ্রামের দক্ষিণ সীমান্ত। স্থানীয় লোকের

কথায় জায়গাটার নাম 'পয়েন্ট'। পয়েন্ট থেকে তিনটে রাস্তার একটা গেছে হাফলঙের দিকে—যেদিক থেকে আমরা হেঁটে এসেছি; দ্বিতীয়টা গেছে মাহুরের দিকে, আর শেষ রাস্তাটা গেছে শিলচরের দিকে। ডক্টর সেনগুপ্ত কুয়াশার মধ্যেই টর্চের আলো ফেলে আকাশটা দেখতে চেষ্টা করছিলেন। তখনই একটা উড়ন্ত পাখি আমাদের চোখে পড়ল পলকের জন্য। পাখিরা অস্থির হয়ে দিশেহারাভাবে আকাশে উড়ছে।

জাটিঙ্গা গ্রামের দিকে তাকিয়ে কয়েকটা আলোর উৎস চোখে পড়ল। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'ওগুলো হ্যাজাকের আলো। পাখি ধরার জন্যে গ্রামের লোকেরা আলো জ্বেলেছে।'

আরও কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে রাত একটা নাগাদ আমরা ফিরে এলাম টাওয়ারে। বারান্দার ফোকাস নিভিয়ে আকোস্তা, পহেলা ও টমাস বিদায় নিয়ে চলে গেল। আকোস্তা বলে গেল, আগামীকাল আবার দেখা করবে।

আমরা চাদর পেতে হাওয়া-বালিশ মাথায় দিয়ে বিশাল টেবিল দুটোর ওপরে শুয়ে পড়লাম। বৃষ্টি তখন ধরে গেছে। বাইরের বারান্দায় বাল্‌বটা জ্বলছিল। ভোল্টেজ এখন স্বাভাবিক হয়ে ওঠায় বালবের আলোর তেজ বেড়েছে। তার টানে অসংখ্য পোকামাকড় এখনও ওড়াউড়ি করছে বাইরে। আমাদের সদর দরজার নীচে ইঞ্চিচারেক ফাঁক থাকায় ঘরেও ঢুকে পড়েছে বেশ কিছু। অতএব ঘরের আলো নিভিয়ে মাথায় মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। টের পেলাম, রাত যত বাড়ছে, শীতও তত জাঁকিয়ে বসছে। নতুন জায়গা বলে সে-রাতে ঘুম আসতে বেশ দেরি হয়েছিল।

দুই

পরদিন ভোর পাঁচটায় যখন ঘুম ভাঙল তখন ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। গতকাল হাফলঙ থেকে তাড়াহুড়ো করে চলে এসেছি। টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাবান, শেভিং কিট কিছুই জাটিঙ্গায় আনা হয়নি। সেগুলো নিয়ে আসার জন্য হাফলঙ যাওয়াটা খুব জরুরি। তাছাড়া ডক্টর সেনগুপ্ত কয়েকটা দরকারি ট্রাঙ্ককল করবেন গেস্ট-হাউস থেকে, আর ফরেস্ট অফিসে গিয়ে দেখা করবেন ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসারের সঙ্গে। সুতরাং সাতটা-সোয়া সাতটা নাগাদ হাফলঙের দিকে রওনা হলাম আমরা। বৃষ্টি তখন থেমে

গেলেও আকাশ মেঘ-থমথমে।

রওনা তো হলাম, কিন্তু কোনও গাড়ির পাত্তা নেই। বেলা সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ মাহুর থেকে একটা বাস আসে। জাটিঙ্গার ওপর দিয়ে যায়। আর সন্ধে ছ'টা নাগাদ আসে শিলচরের বাস। সাড়ে ছ'টায় হাফলঙ পৌঁছয়। এখন কোনও বাসেরই আসার সময় নয়। আর প্রয়োজন এত জরুরি যে, অপেক্ষা করাও যাবে না। সুতরাং দুজনে হাঁটতে শুরু করলাম। মনে আশা, যদি কোনও পথচলতি গাড়ি লিফ্‌ট দেয়। তাছাড়া টাওয়ারে আমাদের পাশের ঘরের মিস্ত্রিভাইদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছি, ইউ. এল. সুচ্যাঙের মূর্তির কাছ থেকে শেয়ারের 'ট্যাক্সি'—মানে জিপ পাওয়া যায়। অতএব জিপ পেয়ে যাব এমন ভরসাও অল্পবিস্তর মনের কোণে উঁকি মারছে।

কিছুটা পথ পেরোনোর পর হঠাৎই পাহাড়ের কোলে দাঁড়ানো একটা বাড়ির দিকে তাকিয়ে ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'চলুন, একবার হেডম্যানের সঙ্গে দেখা করা যাক। এখানে এসে ওঁর সঙ্গে দেখা না করাটা খুব খারাপ দেখায়—।'

হেডম্যান—গ্রামের চলতি কথায় গাঁওবুড়া, অর্থাৎ মোড়ল। নিয়মিত নির্বাচনের মাধ্যমে গ্রামের মোড়ল নির্বাচিত হয়। গ্রামে তাঁর একচ্ছত্র ক্ষমতা। জাটিঙ্গার হেডম্যানের নাম মিস্টার রুপসি। কন্ট্রাক্টারি ব্যবসা করেন। আকোস্তা ও টমাস তাঁর জামাই। তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য পাহাড়ের গা কেটে বসানো পাথুরে ধাপে পা ফেলে আমরা ওপরে উঠতে শুরু করলাম। দু-পাশে জবা গাছের বেড়া। তাতে বড় বড় ফুটফুটে জবা ফুল ফুটে রয়েছে। রঙ অনেকটা গোলাপী।

গোটা কুড়ি সিঁড়ি উঠে বেশ কিছুটা সমতল জায়গা। একপাশে সুন্দর রঙিন ফুলের বাগান। দেখলে মন ভরে যায়। আর অন্য দিকে টিনের ছাউনি দেওয়া ছবির মতো বাড়ি। ঝকঝকে তকতকে উঠোন, বারান্দা, ঘর। উঠোনের একদিকে দড়িতে রাজ্যের জামাকাপড় কেচে শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বারান্দায় কয়েকটা বিভিন্ন বয়েসের বালক-বালিকা ঘোরাফেরা করছে।

হেডম্যানের সঙ্গে আলাপ হল। ডক্টর সেনগুপ্ত ওঁর পূর্ব-পরিচিত। টাওয়ারে এক পিস করে পাঁউরুটি দিয়ে ব্রেকফাস্ট ম্যানেজ করে নিয়েছিলাম। এখানে তার সঙ্গে যুক্ত হল চা-বিস্কুট ও তাম্বুল—অর্থাৎ, পানপাতা ও কয়েকটা গোটা কাঁচা সুপুরি। ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে শুনলাম তাম্বুল দিয়ে

আপ্যায়ন করাটা এখানকার রীতি।

হেডম্যানের বসবার ঘর দেখেই সচ্ছলতার আঁচ পাওয়া যায়। তাছাড়া চোখে পড়ল, একপাশে টেবিলের ওপরে বসানো প্রকাণ্ড আকারের বিদেশী টু-ইন-ওয়ান। বিলাসের আধুনিক উপকরণগুলি দূরপ্রান্তের এই সরল মানুষগুলোর কাছেও এখন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে।

হেডম্যানের বাড়ি থেকে বেরিয়ে আবার পদযাত্রা। পথে লিফ্‌ট্ চাইব এমন কোনও গাড়িও পেলাম না—যদিও চলতে চলতে বহুবারই প্রত্যাশায় পিছন ফিরে তাকিয়েছি। প্রায় দেড়-দু-কিলোমিটার হেঁটে মূর্তির কাছে পৌঁছে দেখি শ্রী ইউ. এল. সুচ্যাঙ ছাড়া সেখানে আর কেউ নেই! মাথায় টুপি পরা শুভ্র আবক্ষ মূর্তি। তাকে ঘিরে বড়সড় চৌকো বেদি। বেদির আশেপাশে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। জিপগুলো সেখানেই দাঁড়ায়। কিন্তু এখন জিপও নেই, আর জিপের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে এমন কোনও মানুষও নেই। বুঝলাম, কপালে দশ কিলোমিটার পদব্রজে যাত্রাই লেখা আছে। অতএব, মনকে তৈরি করে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

পাহাড় কেটে তৈরি আঁকাবাঁকা পিচের রাস্তা। ১৯৪৮ সালে এই রাস্তা তৈরির কাজ শেষ হয়। বয়েসটা চিন্তা করলে রাস্তার তবিয়ত বেশ ভালোই। সরু রাস্তার দু-পাশে হাত চার-পাঁচেক করে খালি জায়গা। সেখানে পাহাড়ের দিকটায় রয়েছে লাল রুক্ষ মাটি আর পাথর। কিন্তু খাদের দিকে সবুজ ঘাস ও চারা গাছপালায় ঢাকা। কোথাও কোথাও খাদের দিকে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া আছে, বাকি সব জায়গা খোলামেলা। একটু উঁকি মারলেই চোখে পড়ে ঘন গাছপালার জঙ্গল অথবা সবুজ ঢাল। তার কোলে কোলে সমতল জমি কেটে তৈরি হয়েছে দু-একটা ঘরবাড়ি।

আমাদের চলার পথে বাঁ দিকে পাহাড়ের দেওয়াল। সেখানে কোথাও চোখে পড়ছে রুক্ষ লাল মাটি-পাথর। আবার কোথাও বা সবুজে ঢাকা। গাছপালার মধ্যে বেশিরভাগটাই বাঁশগাছের জঙ্গল। তবে ম্যারাপ বাঁধে যে-বাঁশ দিয়ে সেই বাঁশ নয়—মূলী বাঁশ, যে-বাঁশ থেকে বাঁশি তৈরি হয়। পথে অসংখ্য বাঁশ গাছ ঝুঁকে আছে আঁকাবাঁকা রাস্তার ওপরে। তাদের লম্বা লম্বা সরু পাতা যেন ঝালর—বাতাসে অল্প অল্প দুলছে।

মেঘ কেটে গিয়ে ইতিমধ্যে রোদ ফুটেছে। পথের বাঁকে দাঁড়িয়ে অবাধ দৃষ্টিতে বরাইল শৈলমালাকে ভীষণ সুন্দর লাগছে। তার সবচেয়ে উঁচু শৃঙ্গ মাউন্ট হেম্পিও—উচ্চতা প্রায় পাঁচ হাজার ফুট হবে—যেন দু-পাশে দু-

হাত মেলে ছড়িয়ে দিয়েছে গিরিমালার তরঙ্গ, যা এসে মিশেছে কোমল সবুজ উপত্যকায়। এই শৈলশ্রেণীর ওপারেই রয়েছে মণিপুর রাজ্য।

চড়াই রাস্তায় হাঁটতে বেশ কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু প্রাকৃতিক দৃশ্য ও ঠাণ্ডা বাতাস সেই কষ্টের অনেকটাই জুড়িয়ে দিচ্ছিল। ফলে সময় কেটে যাচ্ছিল সহজে। আর পথও একটু একটু করে কমে আসছিল। তবুও মাঝে মাঝে গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে একটু জিরিয়ে নিয়েছি আমরা।

প্রায় ঘণ্টাখানেক চলার পর মহাদেবটিলা নামে একটা জায়গায় পৌঁছলাম। সেখানে জনবসতি, দোকানপাট সবই রয়েছে। ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে শুনলাম, মহাদেবটিলায় শ-খানেকের ওপর বাঙালি ঘর রয়েছে, আর রয়েছে কুকি উপজাতির বসতি। রাস্তার বাঁ দিকে বাঙালিদের বসতি আর ডানদিকে থাকে কুকিরা। দু-দিকেই এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ী ঢাল নেমে গেছে। তারই খাঁজে খাঁজে খড় ও টিনের ছাউনি দেওয়া ঘরগুলো দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে হাফলঙ হিল রেল স্টেশন বেশ কাছে। লোয়ার হাফলঙ, যেখানে আমরা ট্রেন থেকে নেমেছিলাম, তার পরের স্টেশন বাগেটার। আর বাগেটারের পরেই এই হাফলঙ হিল।

মহাদেবটিলার এক বাঙালির চায়ের দোকানে বসে খানিকক্ষণ বিশ্রাম নিলাম। সেই সঙ্গে চা-বিস্কুটও খাওয়া হল আর-একবার। দোকানদার এবং তার প্রতিবেশী অনেকের সঙ্গেই ডক্টর সেনগুপ্তের যে ভালোরকম পরিচয় রয়েছে সেটা তাঁদের কথাবার্তা থেকেই স্পষ্ট বুঝতে পারলাম।

দোকান থেকে বেরিয়ে আবার হাঁটা শুরু হল। এতক্ষণ পথে লোকজন বিশেষ চোখে পড়েনি, গাড়িও দেখেছি কম। কিন্তু মহাদেবটিলার পর থেকে দুটোই সংখ্যায় কিছুটা বেড়ে গেল।

আরও ঘণ্টাখানেক পর শ্রান্ত-ক্লান্ত অবস্থায় গেস্ট হাউসে গিয়ে পৌঁছলাম। সকালের স্নান-খাওয়া-দাওয়া সেখানেই সেরে নিলাম। দুপুরে ঘুমিয়েও নেওয়া গেল খানিকটা। গোগোইয়ের ঘরে 'মিস্ট নেট' ছিল। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার আগে, বেলা এগারোটা নাগাদ, ডক্টর সেনগুপ্ত আর গোগোই মিলে একটা মিস্ট নেট টাঙিয়ে দিয়েছিল গেস্ট-হাউসের লনের এক প্রান্তে, পাখির খাঁচাটার ঠিক পাশে।

মিস্ট নেট বা 'কুয়াশা-জাল' ব্যবহার করা হয় পাখি ধরার জন্য। খুব মিহি কালো নাইলনের সুতো দিয়ে বোনা হয় এই জাল। দু-পাশে দুটো খুঁটি দিয়ে ফুটবল খেলার গোলপোস্টের জালের মতো খাড়াভাবে টাঙিয়ে

দিলে একটু দূর থেকে জালটাকে ঠিকমতো ঠাহর করা যায় না। জালের পিছনে গাছপালার সবুজ পটভূমি থাকলে তো সেটাকে একরকম অদৃশ্য বলেই মনে হয়। সেই কারণেই উড়ন্ত পাখিরা ধরা পড়ে এই জালে। তাদের পালক আটকে যায় নাইলনের সুতোয়। ধরা পড়া পাখি নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টায় ছটফট করলে তার অবস্থা হয় আরও সঙ্গিন। আরও আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে যায় জালের সঙ্গে। 'কুয়াশা-জাল' দিয়ে ধরা পাখির ওপরেও গবেষণা চালাচ্ছেন ডক্টর সেনগুপ্ত। জাটিঙ্গার পাখি নিয়ে গবেষণার কাজে এই গবেষণা একটা সম্পর্কিত অংশবিশেষ।

লনের পাখির খাঁচাটা বেশ বড়। অন্তত দশ বাই পাঁচ তো হবেই। কাঠের ফ্রেমে তারের জাল লাগানো। চালের অর্ধেকটা অ্যাসবেস্টসে ঢাকা, বাকিটা জাল দিয়ে। খাঁচার ভেতরে লাগানো রয়েছে নানান গাছপালা—অনেকটা কৃত্রিম জঙ্গলের ঢঙে। আর রয়েছে জল খেতে দেওয়ার পাত্র। খাঁচায় তখন কোনও পাখি ছিল না। গোগোইয়ের কাছে জানা গেল, দু-চারটে চড়ুই পাখি ধরে সে খাঁচায় রেখেছিল, তবে সেগুলো খাঁচার ছোটখাটো কোনও ফাঁক-ফোঁকর দিয়ে হয়তো পালিয়ে গেছে। খাঁচাটা সামান্য মেরামতের দরকার।

অসমতল ঘাসজমির ওপরে বিশাল এলাকা নিয়ে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের গেস্ট-হাউস। ফুলের বাগান, ঢালু সবুজ লন, খোলামেলা ঘর, লাউঞ্জ, বারান্দা, বড় বড় পাইন-দেবদারু গাছ, গাছে পাখির কিচিরমিচির, আর বিস্তৃত লনের সীমানা ছাড়ালেই শুরু হয়েছে কৃত্রিম সরোবর—কয়েকটা সাদা হাঁস সেখানে সাঁতার কাটছে; এছাড়া দূরের অপরূপ পাহাড়শ্রেণী তো আছেই!

বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে এইসব সৌন্দর্যের সুবাস শরীরে মনে মেখে নিচ্ছিলাম। কিন্তু সময় অল্প। সুতরাং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে তৈরি হলাম কিছুক্ষণের মধ্যেই। তারপর তিনজনে রওনা হলাম হাফলঙ বাজারের দিকে। সেখানে থেকেই জাটিঙ্গা যাওয়ার জিপ পাওয়া যাবে।

জিপে চড়ে রওনা হলাম, এবং গতকালের মতোই জাটিঙ্গার বেশ খানিকটা আগে থেকেই হঠাৎ করে কুয়াশার দেখা পেলাম। পৌঁছতে পৌঁছতে সন্ধে হয়ে গেল। আকাশ মেঘে ঢাকা, তার ওপর গাঢ় কুয়াশা। এখন শুধু ঠিকমতো বাতাস দিলেই হয়।

টাওয়ারে ফিরে ম্যাগনেটোমিটার, চুম্বক, কম্পাস ইত্যাদি বগলদাবা করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মাপজোখের কাজে। এসব অঞ্চল ডক্টর সেনগুপ্তের নখদর্পণে। অতএব তাঁর নির্দেশ মতো তাঁকে অনুসরণ করে পথ চলেছি আমি আর গোগোই।

টাওয়ার থেকে বেরিয়ে পাহাড়ী পথ ধরে আমরা ওপরে উঠতে লাগলাম। আজ টর্চ আনতে ভুল হয়নি। ডক্টর সেনগুপ্তের হাতে টর্চ, কাঁধে ক্যামেরা, মাথায় খাকি টুপি, পায়ে জবরদস্ত হান্টার জুতো। আমাদের পোশাকও অনেকটা একইরকম।

আজ ঠাণ্ডা মন্দ নয়। গোগোই শীতের পোশাক না আনায় ওর ওয়াটারপ্রুফ গায়ে চাপিয়ে নিয়েছে—যদিও বৃষ্টি এখনও শুরু হয়নি। তবে জাটিঙ্গার অনিশ্চিত আবহাওয়ায় বৃষ্টিকে বিশ্বাস কী!

যে-পাহাড়ী পথের কথা বলছি তা কিন্তু পাথুরে নয়, মাটির। এখানকার বেশিরভাগ পাহাড়ই লাল মাটি আর কিছু পরিমাণ পাথরের সংমিশ্রণে গড়া। তাতে মনে হয় বরাইল গিরিমালার বয়েস বেশি নয়। গতকালের বৃষ্টিতে মাটি ভিজে গিয়ে পথটা বেশ মসৃণ হয়ে গেছে। ফলে যে-কোনও মুহূর্তে পা পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা। মাত্র এক ফুট চওড়া পথ। পাশাপাশি দুজন হাঁটা যায় না। পথের দু-পাশে ঘাস, আর তার গায়ে ঘন জবা-ঝোপের বেড়া। বেড়ার ওপিঠে দু-চারটে বড়সড় গাছ যে চোখে পড়ছে না এমন নয়। কিন্তু তারপরেই সব অন্ধকার আর কুয়াশা। তবে অন্ধকার রাত সরগরম করে রেখেছে অসংখ্য পোকামাকড়ের কানফাটানো ঐকতান।

কিছুটা চড়াই ভাঙতেই খাসিয়াদের ঘরের আলো চোখে পড়ল। অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম তাদের ঘরবাড়ি। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'এখান থেকেই ওদের ঘন বসতি শুরু হল। এই উটের কুঁজের মতো পাহাড়ের ওপরে, খাঁজে, কোলে, নানান জায়গায় খাসিয়ারা সুবিধেমতো নিজেদের ঘরবাড়ি তৈরি করে নিয়েছে।'

একটু পরেই পথের মসৃণতা মিলিয়ে গিয়ে এবড়ো-খেবড়ো চড়াই রাস্তা শুরু হল। তারপর পেলাম পাথরের তৈরি কয়েক ধাপ সিঁড়ি। তারপর আবার পাথুরে চড়াই, আবার লাল মাটি, আবার কয়েক ধাপ প্রাকৃতিক সিঁড়ি। বহুরূপী পথের খাড়াই এত বেশি যে, কিছুটা ওঠার পরই হাঁফ ধরে গেল। কিন্তু থামার কোনও উপায় নেই।

মিনিট বিশ-পঁচিশ পর মোটামুটি সমতল পথে উঠে এলাম। পাথর,

কাঁকড়, আর লাল মাটির রুক্ষ পথ। দু-পাশে খাসিয়াদের ঘর। এবারে কিছুটা সহজভাবে পথ চলতে লাগলাম। রাত আরও গাঢ় হয়েছে, সেই সঙ্গে কুয়াশাও। এলোমেলো ঠাণ্ডা বাতাসে শীত-শীত করছে।

আমাদের গন্তব্যস্থল জাটিঙ্গা চার্চ।

চার্চের নাম প্রেসবিটারিয়ান চার্চ। স্থাপিত হয়েছে ১৯১০ সালে। কাঁচা পথ থেকে কয়েক ধাপ সিঁড়ি উঠলে বুক সমান উঁচু লোহার দরজা। দরজাটা এখন খোলা, কারণ উপাসনার সময় হয়ে এসেছে, গাঁয়ের মানুষজন একজন দু-জন করে আসতে শুরু করেছে।

ছোট দরজা পেরোলেই ঘাসে-ঢাকা চার্চ কম্পাউন্ড—মাপে প্রায় তিন-চার কাঠা হবে। কম্পাউন্ডের পরেই ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ছোট গির্জাটি। তার দু-পাশে দুটি দরজা, মাঝে বড় কাচের জানলা। খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত গ্রামের মানুষরা সন্ধ্যায় নিয়মিত হাজিরা দেয় এখানে।

চার্চ কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা ছোট ভিত্তি সৌধ ছিল। তার সিমেন্টের ধাপের ওপরে কম্পাস বসিয়ে দিলেন ডক্টর সেনগুপ্ত। কম্পাউন্ডের আশেপাশে কয়েকটা বড় বড় গাছগাছালি ছিল। উনি তাদের পাতার দুলুনি দেখে বাতাসের মোটামুটি গতিবেগ হিসেব করে নিলেন। বললেন, 'আজ বোধহয় ফেনোমেনন হবে না, বড্ড এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে—।'

কম্পাউন্ডের ঘাসের ওপরে ম্যাগনেটোমিটার রেখে আমি পরীক্ষা শুরু করলাম। গোগোই আমাকে সাহায্য করছিল। চার্চের দরজায় যে আলো জ্বলছে তার রেশ কম্পাউন্ডে বেশিদূর আসেনি। ফলে গোগোই যন্ত্রের ওপরে টর্চের আলো ফেলে আমার রিডিং নেওয়ার সুবিধে করে দিচ্ছিল। এখানেও যন্ত্র অনুভূমিক করতে বেশ বেগ পেতে হল। পরে দেখেছি, ফিল্ডে সব জায়গাতেই মাপজোখের সময়ে এই একই অসুবিধেয় পড়তে হয়েছে।

গির্জায় ঘণ্টা বাজল। উপাসনাও শুরু হল। কোথাও বোধহয় ছোটখাটো লাউডস্পিকার লাগানো ছিল। কারণ শুনতে পেলাম, যাজকের স্বর মাইকের মধ্যে দিয়ে বাইরে ভেসে আসছে। বলা বাহুল্য, উপাসনার ভাষা খাসি—খাসিয়াদের মাতৃভাষা। পরে স্কুল-পড়ুয়া ছেলেমেয়েদের পাঠ্যবই দেখে জেনেছি খাসি ভাষার হরফ ইংরেজি। যতদূর মনে হয়, বিদেশী যাজকরাই প্রথমে এই উপজাতীয় কথ্য ভাষাটিকে ইংরেজি হরফের সাহায্যে লিখিত রূপ দেন।

আমাদের মাপজোখের কাজ চলতে লাগল। আমাদের দেখে কৌতূহলী

হয়ে বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভিড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল। দু-একটা বাচ্চা তো একেবারে যন্ত্রের ওপর ঝুঁকে পড়ছিল।

মাঝে সামান্য সময়ের জন্য ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হয়েছিল, তবে তার জন্য খুব একটা অসুবিধে হয়নি।

ঘন্টাখানেক ধরে চার্চ কম্পাউন্ডের মাপজোখের কাজ শেষ করে যন্ত্র বগলদাবা করে আমরা আবার রওনা হলাম। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'এখন আমরা সুচ্যাঙের মূর্তির কাছে গিয়ে মেজারমেন্ট নেব। কারণ ওটাই হচ্ছে গাঁয়ের সীমানা। তার পরে আর পাখি যায় না—আলো দিলেও না।'

গ্রামের ভেতর দিয়ে উঁচু-নিচু অন্ধকার পথ। তবে ডক্টর সেনগুপ্তের সবই ভীষণ চেনা। টর্চের আলো জ্বেলে আত্মবিশ্বাসী পা ফেলে উনি এগিয়ে চললেন। পিছনে আমি আর গোগোই।

পথে দু-এক জায়গায় কয়েকটি খাসিয়া ছেলেকে দেখলাম। হ্যাজাক লণ্ঠন জ্বেলে পাহাড়ের ঢালের মুখে দাঁড়িয়ে পাখির জন্য অপেক্ষা করছে। তাদের হাতে প্রায় বারো-চোদ্দ ফুট লম্বা মূলী বাঁশের লাঠি—অনেকটা মাছ ধরার ছিপের মতো। লাঠির ডগার কাছটা, প্রায় চার-পাঁচ ফুট, সরু লিকলিকে। হ্যাজাক লণ্ঠনের একটা দিক টিনের পাতে ঢাকা, যাতে শিকারীদের চোখে আলো পড়ে চোখ ধাঁধিয়ে না যায় এবং উড়ে আসা পাখিকে যাতে স্পষ্টভাবে দেখা যায়।

ডক্টর সেনগুপ্তকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করলে উনি বললেন, 'দিশেহারা পাখিগুলো অনেক সময় আলোর সামনে এসে সরাসরি ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে মাথার ওপরে বারকয়েক চক্কর খায়। তখনই এই পাখি শিকারীরা ছিপটি দিয়ে উড়ন্ত পাখিকে আঘাত করে। আহত পাখিটা পড়ে গেলেই সেটিকে তারা সংগ্রহ করে, তারপর খায়।'

পরে এ-ঘটনার অনেকটা স্বচক্ষে দেখেছি, সুতরাং নিজের দায়িত্বে লিখতে কোনও দ্বিধা নেই।

মিনিট পনেরো-কুড়ির মধ্যে পাহাড়ী পথ পেরিয়ে পৌঁছে গেলাম মূর্তির কাছে। পথের শেষটুকু ঢালু। বাঁ দিকে ঝোপে ঢাকা পাহাড়ের দেওয়াল, আর ডানদিকে খাড়া খাদ—ঝুঁকে পড়লেই নীচে পিচের রাস্তা অস্পষ্টভাবে দেখা যাবে।

মূর্তির চারপাশের সিমেন্টের বেদির ওপরে ম্যাগনেটোমিটার রেখে মাপজোখের কাজ শুরু করলাম। অন্ধকারে টর্চের আলো জ্বেলেই রিডিং

নিতে হল। স্যাঁতসেঁতে কুয়াশা ভেসে বেড়াচ্ছে আমাদের চারিদিকে। দূরে অস্পষ্টভাবে দু-একটা আলোর বিন্দু চোখে পড়ছে—হ্যাজাক বাতির আলো। আর মাঝে মাঝে শোনা যাছে তীক্ষ্ণ হিসহিস শব্দ। খাসিয়া যুবকরা উড়ন্ত পাখি লক্ষ করে মূলী বাঁশের চাবুক চালাচ্ছে, অথবা আসল শিকারের আগে বারকয়েক বাতাস কেটে প্র্যাকটিস করে নিচ্ছে।

জাটিঙ্গার সীমান্তে মাপজোখ শেষ করে পিচের রাস্তা ধরে আমরা রওনা হলাম পয়েন্টের দিকে।

পয়েন্ট জায়গাটা হচ্ছে অনেকটা কালকাতার এসপ্ল্যানেড বা চৌরঙ্গীর মতো। অর্থাৎ, ওই তিনরাস্তার মোড়ই হল জাটিঙ্গার সবচেয়ে জমজমাট জায়গা। জমজমাট বলতে রাস্তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে তিনটে চায়ের দোকান, তাও বর্তমানে তিনটের মধ্যে একটিমাত্র খোলা—শিবরাত্রির সলতে হয়ে জ্বলছে। সেই দোকানের মালিক গিরীন্দ্র চেটিয়া। বেঁটেখাটো, ফরসা, অল্পবয়েসী অসমীয়া যুবক। বাড়ি করিমগঞ্জে। বহু বছর হল জাটিঙ্গায় দোকানঘর ভাড়া নিয়ে ব্যবসা করছে। দোকানটা মাপে বড়, তবে চেহারায় বেশ পুরোনো ও জীর্ণ। মেঝে মাটির। সামনের দিকে গাড়িবারান্দার মতো চাটাইয়ের ছাদ—বাঁশের খুঁটির ওপরে দাঁড় করানো, আর মূল দোকানের ছাউনি টিনের। বাইরে বসার জন্য একটা বাঁশের তক্তপোশ আর গোটাদুয়েক ছোট বেঞ্চি রয়েছে। দোকানের একদিকে ছোটবড় অনেকগুলো কাঁচের শোকেস। তার চেহারা অত্যন্ত মলিন এবং বেশিরভাগই খালি। তারই মাঝে ছোট্ট একটু ফোকর বের করে পান-বিড়ি-সিগারেট বিক্রির ব্যবস্থা; পাশে ক্যাশবাক্স, নোটবই, পেনসিল আর দোকানীর বসার জায়গা। দোকানের অন্য প্রান্তে চায়ের যাবতীয় বন্দোবস্ত। পাতা উনুনে কাঠের আগুন জ্বলছে। তার পাশেই দোকানে প্রবেশের কপাটহীন দরজা। ভেতরে নীল রঙ করা বেতের সোফা-সেট, টেবিল—গদির কোনও বালাই নেই। এছাড়াও রয়েছে কয়েকজোড়া কাঠের বেঞ্চি ও টেবিল—স্কুলের ক্লাসরুমে যেমনটি থাকে।

দোকানের পিছন দিকে পাহাড়ী খাদ আর দুর্গম ঘন জঙ্গল। কুয়াশার জন্য বেশি দূর দেখা যাচ্ছে না। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'পেছনের খাদটা নালার মতো গভীর হয়ে সোজা পশ্চিমমুখী গিয়ে হারাঙ্গাজাও উপত্যকায় মিশেছে।'

গিরীন্দ্রর দোকানে যন্ত্রপাতি রেখে আমরা চা খেলাম। দোকানের শো-

কেসের নীচে ছোট ছোট রসালো আনারস রাখা ছিল—স্থানীয় ফল। সুতরাং তাও চেখে দেখলাম। তারপর গিরীন্দ্রকে বলে দিলাম আমাদের রাতের খাবারের ব্যবস্থা করতে। রাস্তা পেরিয়ে দোকানের ঠিক উলটোদিকেই গিরীন্দ্রর ঘর। ও বলল, রাত সাড়ে ন'টা-দশটা নাগাদ সেখানে গেলে ও ভাত-ডাল-তরকারি যেমন পারবে সেরকম রেঁধে খাওয়াবে। রাজি না হওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই। এই পাণ্ডববর্জিত জায়গায় নিয়মিত ডাল-ভাত খেতে পাওয়া যাবে এটাই অনেক। সেদিন থেকে শুরু করে দীর্ঘ একটি মাস গিরীন্দ্র আমাদের রোজ রেঁধে খাইয়েছে।

সুতরাং বিশ্রামের পালা শেষ করে যন্ত্রপাতি নিয়ে এসে দাঁড়ালাম তিন রাস্তার মোড়ে। গিরীন্দ্রর দোকান থেকে মাত্র দশ-বারো পা হাঁটলেই এই ত্রিপথ সঙ্গম। সঙ্গমস্থলে কোমর সমান উঁচু একটি গোলচক্কর তৈরি করা আছে। প্রায় এক ফুট চওড়া সিমেন্টের প্রাচীর। তার ভেতরে কয়েকটা পাতাবাহার গাছ—অবহেলায় কোনওরকমে টিকে আছে। চক্করের ঠিক কেন্দ্রবিন্দুতে বসানো রয়েছে একটি রোড-সাইন—যা থেকে জানা যায় মাহুরের দূরত্ব তেইশ কিলোমিটার, শিলচরের একশো ন'কিলোমিটার, আর হাফলঙ ন'কিলোমিটার দূরে। চক্করের খাটো পাঁচিলের ওপরে যন্ত্রপাতি নামিয়ে মাপজোখ শুরু করে দিলাম।

অন্ধকার ও কুয়াশার বুক চিরে কোনও পাখির মিহি ডাক কানে এল। চিক-চিক....চিক-চিক....। পাখিটা ডাকছে, ডেকেই চলেছে। অস্পষ্টভাবে আর-একটা পাখির উত্তরও যেন শুনতে পেলাম। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'বোধহয় রাডি কিংফিশার—লাল মাছরাঙা। পাহাড়ী এলাকায় থাকে—আবার সুন্দরবনেও পাওয়া যায়।'

তখন পাখিটাকে না দেখতে পেলেও পরে দেখেছি। যে-নীল মাছরাঙা সাধারণত গ্রামবাংলায় দেখা যায়, আকারে অনেকটা তারই মতো। তবে গায়ের রঙ মরচে লাল। ঠোঁটও লাল রঙের। পাখিটা ডেকে চলছে এখনও। একই ছন্দে, একই সুরে।

মাপজোখের কাজ শেষ করে আমরা গিরিনের ঘরে খেতে গেলাম। ওর ঘরটা পিচের রাস্তা থেকে প্রায় দেড়মানুষ উঁচু জমির ওপরে। মাটি কেটে সিঁড়ির ধাপের মতো করা আছে।

টর্চের আলো ফেলে সাবধানে ওপরে উঠলাম। টিনের চালে ছাওয়া পুরোনো একতলা বাড়ি। চারপাশে বেশ কিছুটা ঘাসজমির চৌহদ্দি রয়েছে।

সামনে কাঁটাতারের বেড়া আর একটা ছোট লোহার দরজা। দরজা পেরিয়ে খোলা উঠোন শেষ হলেই ছোট একফালি বারান্দা। সেখানে একটা বাল্‌ব জ্বলছে।

বারান্দায় পৌঁছে আমরা ভেজানো দরজা খুলে ঘরে ঢুকলাম। আট বাই আট ছোট ঘর। ঘরে টিউব লাইট জ্বলছে, আর আলোর আকর্ষণে অসংখ্য পোকামাকড়-মথ ফরফর করে উড়ছে। ঘরের একপাশে জানলা ঘেঁষে ছোট টেবিল আর বেঞ্চি ছিল। আমরা গিরিনের নাম ধরে ডেকে বেঞ্চিতে বসে পড়লাম।

ঘরটা ছোট হলেও আসবাবপত্র অনেক। একটা বেতের খাটে পাতা রয়েছে পরিপাটি বিছানা। এছাড়া দুটি বেতের সোফা ও একটা টেবিলে একটা বাঁশের ছাইদান রয়েছে।

গিরিন রান্নাঘরে ব্যস্ত ছিল। আমাদের সাড়া পেয়েই হাসিমুখে ছুটে এল। এবং অলৌকিক তৎপরতায় সামনে হাজির করে দিল ডাল, ভাত, তরকারি আর ডিমের ওমলেট। একেবারে রাজকীয় খাবার! তাছাড়া, যেমন সুন্দর রান্না তেমনই পরিবেশনের তদারকি। কথায় কথায় জানলাম, গিরিনের বাড়িটা জাটিঙ্গা হাসপাতালের এক কর্মচারীর কোয়ার্টার ছিল। সে নিজের বাড়িতে চলে যাওয়ায় গিরিনকে এখানে এমনিই থাকতে দিয়েছে। গিরিনের সঙ্গে এখানে থাকে ওর বৃদ্ধ বাবা, ছোটভাই শুকুর, আর এক ভাইপো—নাম দিলীপ। এখন চাষের কাজে বাবা গেছে দেশ করিমগঞ্জে। ফলে দোকান দেখাশোনা করে গিরিন নিজে। আর পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে ওকে সাহায্য করে দিলীপ ও শুকুর। ওরা দুজনে হাফলঙ স্কুলে পড়ে।

দিলীপ আর শুকুরকে একটু আগে চায়ের দোকানে দেখেছি। এখন গিরিনের অনুপস্থিতিতে ওরা হয়তো দোকান তদারকি করছে। মাহুর ও শিলচরের পথে যেসব জিপ ও ট্রাক যাতায়াত করে তাদের যাত্রী বা চালকরা পয়েন্টে গাড়ি থামিয়ে চা-টা খায়, জিরিয়ে নেয়। ফলে চেটিয়াদের দোকান বেশ ব্যস্ত থাকে।

টাওয়ারে ফিরে এলাম সাড়ে দশটা নাগাদ। বাতাস এখনও এলোমেলো। পাখি পড়ার আশা নেই। কিন্তু হঠাৎ করে বাতাস ঠিকমতো হয়ে গেলে এবং ঝিরঝিরে বৃষ্টি শুরু হলে পাখি পড়তেও পারে। সেই আশাতেই এখনও অনেক শিকারী হ্যাজাক জ্বেলে জাটিঙ্গার এখানে-ওখানে অতন্দ্র হয়ে অপেক্ষা করছে।

আমাদের বারান্দায় সার্চ লাইট আজ জ্বালানো হয়নি, তবে বাল্‌বটা পুরো দমে জ্বলছিল। পাশের ঘরের রাজমিস্ত্রিভাইয়েরা শুয়ে পড়েছে। আমরা বারান্দায় বসে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম। দেখি একটা বাঘা বেড়াল বারান্দার এক কোণে চুপটি করে বসে আছে। অনেক পোকামাকড় উড়ছিল। শব্দ করে বারবার ঠিকড়ে পড়ছিল মেঝেতে। হঠাৎই বেড়ালটা চমকে দেওয়া ক্ষিপ্রতায় একটা বড়সড় পোকাকে ধরে ফেলল। তারপর দিব্যি সেটা মুখে পুরে চোখ বুজে ঘাড় কাত করে মাথা ঝাঁকিয়ে চিবোতে লাগল। ব্যাপার-স্যাপার দেখে আমি তো অবাক। সেই সঙ্গে মজাও পেলাম।

ডক্টর সেনগুপ্ত হেসে বললেন, 'এখানে মাছ বলতে গেলে পাওয়াই যায় না। সুতরাং বেড়ালটার ফুড হ্যাবিট বদলে গেছে—মানে, বদলাতে বাধ্য হয়েছে। কে জানে, হয়তো এতক্ষণ পাখির আশায় এই বারান্দায় আলোর কাছে বসে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু যেভাবেই হোক বুঝেছে আজ রাতে পাখি পাওয়ার সম্ভাবনা, কম, তাই পোকা খেয়েই পেটের জ্বালা শান্ত করছে—।'

পোকাটা খাওয়ার পরেও বেড়ালটা চুপচাপ বসে রইল, অপেক্ষা করতে লাগল। কিন্তু আমরা শোওয়ার আয়োজন শুরু করলাম।

আয়তাকার টেবিলটা পাশের ঘরে সরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিল আকোস্তা ও পহেলা। সুতরাং আমার বিছানা করা হল অন্য টেবিলটার ওপরে, ডক্টর সেনগুপ্ত শুয়ে পড়লেন কাঠের পোর্টম্যান্টোর ওপরে, আর গোগোই শুয়ে পড়ল পাশের ঘরে নিয়ে যাওয়া টেবিলে।

শুয়ে শুয়ে কানে আসছে লাঠিতে বাতাস কাটার সাঁই-সাঁই শব্দ। দরজার কাগজে উড়ন্ত পোকামাকড় ঠিকরে পড়ে ফটফট খরখর শব্দ হচ্ছে। আর টাওয়ারের টিনের চালেও অনবরত কিছু ঝরে পড়ছে—শব্দ হচ্ছে একটানা। পরে বুঝেছি, সেটা জোরালো এলোমেলো বাতাসে শুকনো পাতা ঝরে পড়ার শব্দ। মাথার কাছের জোড়া জানলায় শার্সি ছিল। ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচতে সেগুলো বন্ধ করে দিয়েছি। তবে মাঝে মাঝেই জোরালো আলো শার্সি ভেদ করে এসে পড়ছিল ঘরের দেওয়ালে। বুঝলাম, হ্যাজাক লণ্ঠন হাতে দুলিয়ে আমাদের টাওয়ারের পাশ দিয়ে পাখি-শিকারীরা যাতায়াত করছে।

রাত এগারোটা নাগাদ দরজায় খটখট শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়লাম দুজনেই।

দরজা খুলে দেখি আকোস্তা দাঁড়িয়ে। মুখে পান এবং একগাল হাসি। ওর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে একজন খাসিয়া যুবক। উর্দি দেখে মনে হল বনবিভাগের প্রহরী গোছের কিছু। তার হাতে হালকা নীল কাপড়ের একটা ছোট থলে ছিল। আকোস্তা সেটা নিয়ে ডক্টর সেনগুপ্তের হাতে দিয়ে বলল, 'এর মধ্যে একটা থ্রি-টোড কিংফিশার আছে, সার। তিন নম্বর টাওয়ারের লাইটে এসে পড়েছে। আপনাদের এখানে রেখে দিন, কাল এসে নিয়ে যাব। অফিসারদের দেখাব।'

তিন নম্বর টাওয়ারটা পয়েন্টের সামনেই। রাস্তা থেকে বিশ-পঁচিশ ফুট উঁচুতে অনেকটা জমি নিয়ে গোটা দুয়েক ঘর ও একটা দোতলা উঁচু বার্ড-ওয়াচিং টাওয়ার আছে সেখানে। আকোস্তার কাছে শুনলাম আগামীকাল অমাবস্যা, পাখি পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, তাই বনবিভাগের উচ্চপদস্থ অফিসাররা আসবেন তিন নম্বর টাওয়ারে একটা দিন ও রাত কাটাতে, পাখি পড়ার আশ্চর্য ঘটনা স্বচক্ষে দেখবেন। সেইজন্য আমাদের টাওয়ারের সার্চলাইট ও জেনারেটর সন্ধেবেলাতেই ও নিয়ে গেছে তিন নম্বরে।

থলের ভেতরে ছোট পাখিটা নড়ছিল। ডক্টর সেনগুপ্তের হাত থেকে থলেটা নিয়ে আকোস্তা নিজেই সেটাকে ঝুলিয়ে দিল দেওয়ালের একটা পেরেকে। গতকাল ওই পেরেকে একটা থার্মোমিটার ঝোলানো ছিল। আজ নেই। ওটাও নিয়ে গেছে তিন নম্বর টাওয়ারে। সাহেবদের পর্যবেক্ষণের সুবিধের জন্য।

দু-পাঁচ মিনিট কথাবার্তা বলার পর আকোস্তা চলে গেল। ও এখন বাড়ি যাবে। ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে শুনলাম, ওর বাড়ি মূর্তি ছাড়িয়েও কিছুটা দূরে। ওরা চলে গেলে আমরা শুয়ে পড়লাম। বারান্দার আলো কালকের মতোই জ্বালিয়ে রেখেছি। রোজ রাতে ওই আলোটা আমরা জ্বালিয়ে রাখতাম।

তিন

ভোর ছ'টা নাগাদ ঘুম ভাঙল। দুধের মতো সাদা কুয়াশা থইথই করছে চারিদিকে।

আমাদের খিড়কি দরজা খুললেই বাঁহাতে টিন ও চট দিয়ে ঘেরা একটা ছোট্ট ঘর। সেই ঘরে কাঠের আগুন জ্বেলে রান্নাবান্না করে রাজমিস্ত্রিরা।

দলের সবচেয়ে বয়স্ক যে-দুজন, আমাদের ঘরের লাগোয়া ঘরটায় তাঁরাই রান্না করতেন। তাঁদের বাড়ি শিলচরে। ধর্মে মুসলমান। নিয়মিত তাঁদের নমাজ পড়তে দেখেছি। তাই আমাদের কাছে ওঁরা দুজনেই ছিলেন 'চাচা'।

চাচাদের মধ্যে যাঁর বয়েস বেশি—প্রায় পঞ্চান্ন-ষাট হবে—তিনি ভোর হতে না হতেই দলবলের জন্য রান্নাবান্না চড়িয়ে দিতেন উনুনে, আর অদ্ভুত সুরে গান করতেন। শুনতে বেশ ভালো লাগত—যদিও গানের কথা একটুও বুঝতে পারতাম না।

বাইরে বেরিয়ে চাচার গান শুনতে পেলাম এখন। চটের পরদার ফাঁক দিয়ে দেখি চাচা বাঁশের চোঙা দিয়ে কাঠের আগুনে প্রাণপণ ফুঁ দিচ্ছেন। রান্নাঘরটার পরেই সিমেন্টের মেঝের এলাকা শেষ। সেখানে শুরু হয়েছে প্রায় দেড়-দু-হাত নিচু প্রাকৃতিক জমি—টাওয়ারের পিছন দিক।

নিচু জমিতে চাচাদের শোওয়ার ঘরের লাগোয়া একটা সিমেন্ট বাঁধানো চৌবাচ্চা ছিল। সেটাই ছিল আমাদের সকলের সম্মিলিত জলাধার। কোথা থেকে যেন একটা কালো রবারের পাইপ এসে ঢুকে পড়েছে চৌবাচ্চার ভেতরে। এই পাইপ দিয়েই সকালে-বিকেলে ঘণ্টাখানেক করে জল সরবরাহ করে জাটিঙ্গা মিউনিসিপ্যালিটি। জলের পরিমাণ যেটুকু হয় তাতে পাঁচজনেরই সারাদিন চলে কিনা সন্দেহ, আর আমরা তো মোট আঠেরো-বিশ জন। তার ওপর চৌবাচ্চাটা নিতান্ত খোলা জায়গায় বলে সবসময়ই তাতে শুকনো গাছের পাতা, নোংরা কুটো-কাঠি আর রাজ্যের পোকামাকড়ের ডেডবডি ভেসে থাকত। কিন্তু উপায় নেই। সেই জল দিয়েই আমাদের একটা মাস কাজ চালাতে হয়েছে—হাত-মুখ ধোওয়া, স্নান, সবকিছু। শুধু খাওয়ার জলটুকু আমরা পাইপ থেকে সরাসরি সংগ্রহ করে ধরে রাখতাম বোতলে।

চৌবাচ্চার গা ঘেঁষে কয়েকটা থান ইটের ওপরে একটা বড় কাঠের পাটাতন ফেলা রয়েছে। নিচু জমিতে নামলেই সেখানে প্রথম পা ফেলতে হয়। জাটিঙ্গার মাটি খুব সুদৃঢ় নয়। তাই স্নান করা বা কাপড় কাচার কাজ ওই পাটাতনের ওপরে থিতু হয়েই সারতে হয়।

চৌবাচ্চা থেকে একটু দূরে ডানদিকে নিত্যকর্মের জন্য দিব্যি ব্যবস্থা রয়েছে। সিমেন্টের দেওয়ালে ঘেরা, মাথায় টিনের ছাউনি আর এক পাল্লার কাঠের দরজা—একেবারে দু-তরফের ছিটকিনি সমেত। এই রাজকীয় ব্যবস্থা বনবিভাগের অফিসারদের জন্য। এমনিতে দরজায় সর্বদা তালা দেওয়া

থাকে। কিন্তু বনবিভাগের সৌজন্যে সেই চাবি আকোস্তা-পহেলা-টমাস তুলে দিয়েছে আমাদের হাতে। অর্থাৎ যতদিন জাটিঙ্গায় থাকব ততদিন ওই ঘর ও টয়লেট ব্যবহারে কোনও বাধা নেই।

টয়লেটের ঠিক বাঁদিকে দেখলাম একটা ছোট টিনের ঘর। স্পষ্ট বোঝা যায়, ঘরটি অস্থায়ী। দরজার পাল্লা-টাল্লা বলতে কিছু নেই, বরং সেখানে ঝুলছে চটের পরদা। কৌতূহলী হয়ে দেখি, ভেতরে রান্নার কাজ চলছে। পরে জেনেছি, রাজমিস্ত্রি চাচারা দ্রুত কাজ সারার জন্য দু-তিন জায়গায় রান্নার ব্যবস্থা করেছেন। কারণ আটটা-সাড়ে আটটার মধ্যে তাঁদের খাওয়া-দাওয়া সেরে কাজে লেগে পড়তে হয়।

চৌবাচ্চা ছেড়ে সামনে দু-তিন পা এগোলেই জমি শেষ। তারপরই খাড়া ঢাল নেমে গেছে নীচে। অনেকটা নীচে রয়েছে সরু এক চিলতে পায়ে-চলা পথ। তবে বাঁশ গাছের জঙ্গলে তার প্রায় সবটুকুই ঢাকা। এখন তো কুয়াশার জন্য কিছুই চোখে পড়ে না।

বাঁশ গাছ ছাড়াও চোখে পড়ল কয়েকটা তেজপাতা গাছ—ডালপালা ছড়িয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর একটা কাঁঠাল গাছ টাওয়ারের গা ঘেঁষে টিনের চাল ছাড়িয়ে অনেকটা ওপরে উঠে গেছে। হেমন্ত আসছে। পাতা ঝরা শুরু হয়েছে। গত রাতে এই কাঁঠাল গাছই অনবরত পত্রবৃষ্টি করেছে আমাদের ঘরের চালে।

হাত-মুখ ধুয়ে আমরা তৈরি হয়ে নিলাম। স্টেনলেস স্টিলের গ্লাসে জল নিয়ে তাতে ডক্টর সেনগুপ্তের বহু অভিযানের সাথী বেবি ইমারসন রড ডুবিয়ে বিদ্যুৎ খরচ করে জল গরম করলাম। কফি তৈরি হল। গত রাতে গিরিনের দোকান থেকে পাঁউরুটি সঙ্গে আনা হয়েছিল। অতএব তাতে জ্যাম মাখিয়ে বিস্কুট ও কফি সহযোগে ব্রেকফাস্ট-পর্ব শেষ।

হঠাৎ খেয়াল হতেই পেরেকে ঝোলানো থলেটায় হাত দিয়ে দেখি পাখিটা এখনও নড়ছে—তার মানে বেঁচে আছে। সারা রাত থলের পুঁটলি-বন্দি অবস্থায় থেকে খুদে পাখিটা জ্যান্ত থাকবে ভাবিনি। সুতরাং ডক্টর সেনগুপ্তকে বললাম, 'পাখিটা ইলেকট্রোম্যাগনেটের চেম্বারে রেখে দিই—আরামে থাকবে।'

ওঁর অনুমতি পেয়ে পাখিটা নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। তড়িৎ-চুম্বকটা সেখানেই রাখা ছিল। চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে তার মধ্যে পাখির আচার-আচরণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য তড়িৎ-চুম্বকটা এনেছি। সুতরাং তাতে পাখি

রাখার জন্য খাঁচার মতো একটা প্রকোষ্ঠ ছিল। পাখিটা সেখানে রেখে দিলাম। ডানা দুটো সামান্য ছড়িয়ে লাল ঠোঁট ওপর দিকে তুলে বেচারা চুপটি করে বসে রইল। খেতে দিয়ে লাভ নেই, কারণ কোনও খাবারই এসব পাখিরা খায় না।

সাড়ে সাতটা নাগাদ যন্ত্রপাতি নিয়ে আমরা তিনজনে কাজে বেরোলাম। বেরোনোর সময়ে দেখি বারান্দার এক কোনে কয়েকটা পালক পড়ে রয়েছে। ঠিক যেন পাখির গা থেকে কেউ ছাড়িয়ে নিয়েছে। পালকগুলো দেখে ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'ফিমেল কোয়েলের পালক—' অর্থাৎ, স্ত্রী-কোকিল বা ছিট্ কোকিল। মনে হয়, আলোর টানে কাল রাতে পাখিটা টাওয়ারের বারান্দায় এসেছিল, এবং ধৈর্য ধরে অপেক্ষমাণ বাঘা বেড়ালটি যথেষ্ট তৎপরতার সঙ্গে তাকে ভক্ষণ করেছে। সূত্র হিসেবে রেখে গেছে কয়েকটা পালক।

গতকাল 'ফেনোমেনন' বলতে যা বোঝায় তা ঠিক না হলেও দু-একটা উড়োপাখি এখানে-ওখানে এসে পড়েছে। যেমন, আকোস্তার এনে দেওয়া থ্রি-টোড কিংফিশার বা এই কোয়েল। পরে গ্রামে খবর নিয়ে জেনেছি, কাল রাতে কেউ কেউ খাপছাড়াভাবে দু-একটা পাখি পেয়েছে—ফেনোমেনন হলে যেখানে ঝাঁকে ঝাঁকে পাওয়া যায়।

আজ আবার আমরা চড়াইয়ের পথ ধরলাম—অর্থাৎ, গ্রামের দিকে উঠতে শুরু করলাম। দিনের আলোয় গ্রাম ও গ্রামবাসীদের স্পষ্টভাবে দেখতে পেলাম।

প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়ির লাগোয়া ছোট উঠোন আর বাগান। বাড়ির সীমানা ভাগ করে দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ফুলগাছের ঝোপ। তার মধ্যে জবা ফুলই প্রধান। বড় বড় ফুল ফুটে রয়েছে গাঢ় সবুজ পাতার পটভূমিতে। অগুনতি বহুবর্ণ ছোট-বড় প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে যত্রতত্র। জবাফুল ছাড়াও চোখে পড়ল একরকম ছোট ছোট লালফুলের গাছ। গাছের মাথাটা ছাতার মতো ছড়িয়ে গেছে দু-পাশে। লেডিজ আমব্রেলা। দেখলাম, কাঠগোলাপের মতো গাঢ় হলুদ রঙের এক নাম-না-জানা ফুল। তাছাড়া নানারকম গোলাপ তো আছেই!

সকালবেলায় সব বাড়ির উঠোনের দৃশ্য প্রায় একইরকম। মহিলারা কাজে ব্যস্ত। জামাকাপড় কাচাকাচি করে লাইন ধরে মেলে দিচ্ছে উঠোনে টাঙানো দড়িতে। ছড়ানো কাপড়-জামাগুলো রীতিমতো ঝকঝক করছে। জানি না,

সেটা পাহাড়ী জলের গুণ না খাসিয়া রমণীদের পরিশ্রমের ফসল। প্রতিদিন এত কাচাকাচি করে এরা! ডক্টর সেনগুপ্ত হেসে বললেন, 'সাত-আট বছর ধরেই তো দেখছি। বলতে গেলে বিছানার তোশক আর লেপ ছাড়া সবই এরা প্রতিদিন কেচে ফেলে।'

খাসিয়াদের বাড়িগুলো সিমেন্ট, কাঠ, টিন, খড়, দরমা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি। কোনও বাড়ির ছাউনি টিনের, আবার কোনওটার বা খড়ের। এ থেকেই গ্রামবাসীদের সচ্ছলতার একটা শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তবে চেহারা রং-চং করে সব বাড়িই ঝকঝকে তকতকে।

অতি সন্তর্পণে পা ফেলে উঠছিলাম। কোথাও কোথাও পথ বেশ স্যাঁত-সেঁতে, পিছল। দু-পাশের গ্রাম্য বাড়িগুলো থেকে ছোট ছোট বাচ্চারা আমাদের দেখছিল। কেউ কেউ আদুরে গলায় 'ও মামা, ও মামা—' বলে ডাকছিল।

খাসিয়াদের সমাজ মাতৃতান্ত্রিক। হয়তো সেই কারণেই অচেনা লোকের প্রতি সাধারণ সম্বোধন 'মামা' অথবা 'মামী'। প্রায় প্রতিটি বাড়িতেই শিশু চোখে পড়ছিল। ডক্টর সেনগুপ্ত জানালেন, এদের প্রতি ঘরে গড়ে আট-দশটা করে ছেলেমেয়ে, নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু জন্মহার বেশি হলে হবে কী, অযত্ন অপুষ্টিতে মৃত্যুহারও নেহাত কম নয়। বছরসাতেক আগে জাটিঙ্গার জনসংখ্যা বারোশো মতো ছিল। এখন বড়জোর হাজার দেড়েক হবে।

চলতে চলতে আমরা মোটামুটি সমতল পথে উঠে এলাম। সেখানে পথের দু-পাশে বাচ্চাদের দুটো স্কুল চোখে পড়ল। আকাশ-নীল আর সাদা পোশাক পরা ফুটফুটে ছেলেমেয়েরা ক্লাসঘরে বসে আছে। বিস্ময়ভরা চোখে আমাদের দেখছে। স্কুলের একজন বয়স্কা দিদিমণি ডক্টর সেনগুপ্তকে দেখে হাসলেন পরিচিতের হাসি। উনি বললেন, পরে দেখা করে কথা বলবেন।

গির্জাটা স্কুলের ঠিক পরেই, ডানহাতে। কুয়াশা এখন হালকা হয়ে এলেও দূরের পাহাড়গুলো স্পষ্ট নয়, ঝাপসা। ম্যাগনেটোমিটার নিয়ে চার্চ কম্পাউন্ডে নতুন করে মাপজোখের কাজ শুরু করলাম। আজ বিক্ষেপী ও দোলনী—দুটি ম্যাগনেটোমিটারই সঙ্গে এনেছি। ভূ-চৌম্বকক্ষেত্রের অনুভূমিক উপাংশের মান নির্ণয় করতে গেলে দুটি ম্যাগনেটোমিটার দিয়েই মাপজোখ করতে হয়। কিন্তু লক্ষ করে দেখলাম, দোলনী ম্যাগনেটোমিটারের চুম্বক রাখার রেকাবটিতে সামান্য ত্রুটি রয়েছে। পরে প্লায়ার্স দিয়ে সেই

ক্রুটি ঠিক করে নিয়েছিলাম।

ইতিমধ্যে গোগোই হঠাৎ অসুস্থ বোধ করায় ডক্টর সেনগুপ্ত ওকে বললেন টাওয়ারে ফিরে যেতে। তখন দোলনী ম্যাগনেটোমিটারটি ওর হাতে ফেরত পাঠিয়ে দিলাম ক্যাম্পে। কারণ সঙ্গে যে-পরিমাণ যন্ত্রপাতি ও ক্যামেরা-দূরবীন ইত্যাদি রয়েছে তাতে পাহাড়ী পথে চলাফেরা করতে দুজনের যথেষ্ট অসুবিধে হবে।

কয়েকটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভিড় করে আমাদের কাজ দেখছিল। কাজের ফাঁকে ফাঁকে ওদের সঙ্গে আলাপ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু ভাষা বাধা হয়ে দাঁড়াল। ওরা মাতৃভাষা ছাড়া হিন্দি বা ইংরেজি একবর্ণও বোঝে না। পরে অবশ্য স্কুলপড়ুয়া ব্যতিক্রমী বালকদের সন্ধান পেয়েছি।

জলপিপাসা পাওয়ায় কাছে দাঁড়ানো একটি ছেলেকে ইশারায় ব্যাপারটা বোঝালাম। সে এক ছুটে চলে গেল কাছাকাছি একটি বাড়িতে। একটু পরেই এক গ্লাস জল নিয়ে এল। গ্লাসটি অ্যালুমিনিয়ামের। লক্ষ করলাম, একটু নিচু জমিতে একটি কলের কাছে জলের জন্য লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে কয়েকটি খাসিয়া মেয়ে। তাদেরও সব বাসন অ্যালুমিনিয়ামের—এমন কি কলসিও!

জাটিঙ্গা গ্রাম হলে হবে কী, এখানে জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা বেশ ভালো। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ বিপর্যয় হয় বটে, তবে তা মোটামুটি ক্ষণস্থায়ী। আর লোডশেডিং বলে কিছু নেই। যদিও শব্দটা আকোস্তার চেনা। একদিন রাতে হঠাৎ আলো নিভে যাওয়ায় আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'লোডশেডিং?' তাতে আকোস্তা খুব হেসেছিল। বেচারী কলকাতার খবর ওদের কাছেও পৌঁছে গেছে!

চার্চ কম্পাউন্ডের পর মূর্তি। মূর্তির কাছে পৌঁছে দেখি স্কুল য়ুনিফর্ম পরা কয়েকটি বাচ্চা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সেখানে। কারও গোলাপী-সাদা পোশাক। কারও বা নীল-সাদা পোশাক। স্কুলের পোশাক পরা ছোট-বড় ছেলেদেরও দেখলাম দল বেঁধে হেঁটে চলেছে পিচের রাস্তা ধরে। কেউ কেউ বা রাস্তার বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে কোনও গাড়ির জন্য—যদি লিফট পাওয়া যায়। জিজ্ঞেস করে জানা গেল, ওরা যাচ্ছে হাফলঙের স্কুলে পড়তে। রোজই যায়। গাড়ি পেলে গাড়ি, নইলে পায়ে হেঁটে। ছোট ছোট খুকিরাও তাই। গাড়ি পাওয়ার জন্য একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত ওরা অপেক্ষা করে, তারপর হেঁটে রওনা দেয়।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। রোজ যাওয়া-আসা মিলিয়ে আঠারো-বিশ কিলোমিটার পথ! কী করে যায় এই বাচ্চা ছেলেমেয়েরা? ডক্টর সেনগুপ্ত হেসে বললেন, 'আশ্চর্য এদের প্রাণশক্তি। বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই।'

পরে দেখেছি, জাটিঙ্গার গ্রামবাসীদের কাছে হাফলঙে হেঁটে যাতায়াত করাটা উল্লেখযোগ্য কোনও ব্যাপারই নয়। সেদিন ছোট ছোট বাচ্চাদের হেঁটে যাওয়া দেখে মনে মনে বেশ লজ্জাই পেয়েছিলাম। কারণ, গতকাল সকালে হেঁটে হাফলঙ গিয়ে ভেবেছিলাম কী আহামরি পরিশ্রমের কাজই না করেছি!

মূর্তির কাছে কাজ শেষ করে রওনা হলাম পয়েন্টের দিকে। সেখানে মাপজোখের কাজ শেষ করে গিরিনের দোকানে টিফিন ও বিশ্রাম। তখন দেখি গোগোই দোকানের বাইরে তক্তপোশে বসে মাহুর থেকে আসা বাসের জন্য অপেক্ষা করছে—হাফলঙ যাবে। কিছু ওষুধপত্র কেনার আছে, আর ওর নিজস্ব কিছু কাজও রয়েছে। লক্ষ করেছি, হাফলঙ যাওয়ার জন্য স্থানীয় সকলেই পয়েন্টে এসে গিরিনের দোকানে বসে অপেক্ষা করে। দোকানটা যেন একটা অলিখিত বাসস্টপ। ফলে ওর দোকানের তক্তপোশ ও বেঞ্চিতে ভিড় দেখলেই বোঝা যায় মাহুর বা শিলচর থেকে বাস আসবে।

একটু পরেই বাস এল। গোগোই চলে গেল। বলে গেল, পরশুদিন, অর্থাৎ সোমবার আসবে। গিরিনের দোকানে বসেই লক্ষ করছিলাম তিন নম্বর টাওয়ারে বেশ ব্যস্ততা চলছে। অনেকগুলো অ্যাম্বাসাডর ও জিপ এসে দাঁড়িয়েছে পয়েন্টের কাছে। কোনও কোনও গাড়িতে আবার বনবিভাগের লাল-সবুজ প্রতীক চিহ্ন আঁকা। আকোস্তা, পহেলা ও টমাসকে চোখে পড়ল। বিভিন্ন অফিসারদের নিয়ে তারা ভীষণ ব্যস্ত। পয়েন্টের অন্য দুটো দোকান বন্ধ থাকায় চা-কফি বিস্কুট সবই জোগান দিচ্ছে গিরিন। অলৌকিক ক্ষমতায় ছেলেটি যেন দশভুজা হয়ে ঘরকন্না-রান্নাবান্নার কাজ সামাল দিচ্ছে। অথচ মুখের নিষ্পাপ হাসিটি অমলিন। গিরিনের কাছেই শুনলাম, তিন নম্বর টাওয়ারে আজ সারাদিন খানাপিনার ব্যবস্থা রয়েছে। বনবিভাগের তরফ থেকে গ্রামের গণ্যমান্য লোকজনকে নেমন্তন্নও করা হয়েছে।

নেমন্তন্নের ব্যাপারটা আরও টের পেলাম গিরিনের দোকান ছেড়ে এক নম্বর টাওয়ারে রওনা হওয়ার পথে। দেখি জনাকয়েক ছেলে কয়েকটা

চেয়ার মাথায় তুলে সার বেঁধে এগিয়ে আসছে। আরও একটু এগোতেই পহেলাকে দেখতে পেলাম। আমাদের ঘরের ডিম্বাকৃতি টেবিলের ওপরের অংশটি কাঁধে করে ও টাওয়ারের সিঁড়ি ভেঙে নেমে আসছে। ওর ঠিক পিছনে আরও দুজন : তাদের হাতে টেবিলের ফ্রেম ও পায়ার অংশ। বুঝলাম, সাহেবদের জন্য সুব্যবস্থা করতে এক নম্বর টাওয়ারের সমস্ত আসবাবই চালান হচ্ছে তিন নম্বরে।

সিঁড়ি বেয়ে ঘরে পৌঁছে তার প্রমাণ পেলাম হাতেনাতে। ঘরটাকে এখন বেশ বড় আর ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। আসবাব বলতে রয়েছে বুক কেস, পোর্টম্যান্টো, গোটা তিনেক স্টিলের চেয়ার আর সুইচবোর্ডের নীচে রাখা খাটো বেঞ্চিটা। সুতরাং গিরিনের দোকানে দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে দিবানিদ্রার প্রয়োজনে এই প্রথম ভূমিশয্যা গ্রহণ করলাম। এই প্রসঙ্গে জানিয়ে রাখি, জাটিঙ্গায় যতদিন ছিলাম আমাদের শয্যা-ব্যবস্থার কোনও 'উন্নতি' হয়নি।

বিকেলে কফি খেয়েই আমরা রওনা হলাম জাটিঙ্গা রেল স্টেশনের দিকে।

গ্রামের সর্বোচ্চ বিন্দু থেকে রেল স্টেশন প্রায় ১০০ মিটার নীচে। পশ্চিম দিকে ওটাই গ্রামের সীমানা। ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে শুনলাম, ওখানে প্রচুর পাখি পড়ে। সুতরাং যন্ত্রপাতি বগলদাবা করে চড়াই-এর পথ ধরে আমরা গ্রামের দিকে উঠতে লাগলাম।

আগেই বলেছি, জাটিঙ্গা গ্রামটি উটের কুঁজের মতো একটা পাহাড়ী টিবির ওপরে গড়ে উঠেছে। সেই কুঁজ অতিক্রম করে ঢালু পাহাড়ী পথ ধরে অনেকটা নেমে তবেই পৌঁছনো যায় স্টেশনে। অন্তত তিন-চার কিলোমিটার পথ হবে বলে আমার বিশ্বাস।

চলতে চলতে রোদ মরে এসেছিল। চোখে পড়ল একটি সাইনবোর্ড। সকালে চার্চ থেকে মূর্তির দিকে যাওয়ার সময়েও সাইনবোর্ডটা দেখেছিলাম। তাতে লেখা ঃ লাঙপি দেহাঙ্গী রুরাল ব্যাঙ্ক, জাটিঙ্গা শাখা। এটাই হল জাটিঙ্গা গ্রামের একমাত্র ব্যাঙ্ক। ব্যাঙ্কের চেহারা অবশ্য গ্রামের অন্যান্য ঘরবাড়ির মতোই ঃ টিনের চাল, দরমার দেওয়াল ইত্যাদি। পথে বাচ্চা বাচ্চা খাসিয়া ছেলেরা নজর কাড়ছিল। ওদের প্রায় সকলেরই হাতে গুলতি আর কাঁধে ঝোলানো ছোট্ট কাপড়ের থলি—অনেকটা বটুয়ার মতো। কয়েকজন বাচ্চাকে দেখলাম উত্তেজিতভাবে একটা ঝাঁকড়া গাছ লক্ষ করে

গুলতি চালাচ্ছে। হয়তো কোনও চড়ুই পাখির সন্ধান পেয়েছে সেখানে।

গ্রামের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় পৌঁছে নীচে অনেক দূরে রেললাইনের ওপারে ছবির মতো সবুজ পাহাড়ের ঢালে কয়েকটা ঘরের চাল নজরে পড়ছিল। এ ছাড়া শুধু পাহাড় আর জঙ্গল। পথে এক জায়গায় অনেক তেজপাতা গাছ দেখতে পেলাম। শুকনো তেজপাতা ঝরে পড়ে আছে মাটিতে। কয়েকটা দেশি মুরগি ঘুরে বেড়াচ্ছে সেখানে।

ক্রমশ অন্ধকার হয়ে আসছিল। সন্তর্পণে এবড়োখেবড়ো পথ ধরে আমরা নামতে লাগলাম। মাঝে মাঝে পাথর বসিয়ে খানিকটা পথ সিঁড়ির মতো করে দেওয়া হয়েছে। ডক্টর সেনগুপ্ত রেল স্টেশন এলাকায় তাঁর আগেকার অভিজ্ঞতার কথা শোনাচ্ছিলেন। এখানে মূলত বাঙালির বসতি। বিভিন্ন দোকানপাটও বাঙালির।

স্টেশনের কাছে পৌঁছে দেখলাম স্থানীয় দোকানীরা সকলেই তাঁকে চেনে। পাখি-রহস্য নিয়ে অনেকেই তাঁকে নানান প্রশ্ন করল। এবারে কদ্দূর কী পাওয়া গেল সে-কথাও জানতে চাইল।

ওদের সঙ্গে খানিকক্ষণ কথাবার্তা বলে আমরা নেমে গেলাম প্ল্যাটফর্মে। সেখানে মাপজোখ নিতে বিশেষ অসুবিধে হল না, কারণ প্ল্যাটফর্ম মোটামুটি সমতল ছিল। কাজ শেষ করে আমরা একটা দোকানে চা-বিস্কুট খেয়ে নিলাম। ততক্ষণে বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে।

ফেরার পথে একটু অসুবিধে হল। চারদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। তার ওপর অচেনা পাহাড়ী রাস্তা। টর্চের আলোতেও ঠিকমতো ভরসা পাচ্ছিলাম না। আমি বারবারই পিছিয়ে পড়ছিলাম। অতি সাবধানে কোনওরকম দুর্ঘটনা না ঘটিয়ে চড়াইয়ের পথ শেষ করলাম। তারপর ডক্টর সেনগুপ্ত একটা নতুন পথ ধরে আমাকে নিয়ে পৌঁছে গেলেন মূর্তির কাছে। সেখানে আর একদফা মাপজোখ নিয়ে রাস্তা ধরে রওনা হলাম পয়েন্টের দিকে।

আজ অমাবস্যার রাত। কুয়াশাও রয়েছে। কিন্তু উপযুক্ত বাতাস ও ঝিরঝিরে বৃষ্টি না থাকায় 'ফেনোমেননের' কোনও লক্ষণ নেই। অতএব গিরিনের দোকানে খাওয়া-দাওয়া সেরে টাওয়ারে গিয়ে শোওয়ার ব্যবস্থা করলাম।

জাটিঙ্গায় দিনের বেলা তেমন শীত নেই। শুধু ভোরের দিকটায় একটু ঠাণ্ডা ভাব থাকে। তারপর রোদ উঠে গেলেই গরম। দিব্যি খালি গায়ে থাকা যায়। কিন্তু রাতের বেলায় ব্যাপার-স্যাপার অত সহজ নয়—অন্তত

আমার কাছে। রাত যত বাড়ে, শীতও যেন সমান তালে বেড়ে যায়। অতএব মেঝেতে বিছানা পাতার সময় থেকেই শীত সম্পর্কে একটু আশঙ্কা ছিল।

বিছানা বলতে প্রথমে একটা পাতলা বেডশিট। তার ওপরে পেতে দিলাম স্নানের সাথী একটি প্রমাণ মাপের তোয়ালে। তারপর দু-প্রস্থ পোশাক গায়ে রেখে মাথায় হাওয়া-বালিশ দিয়ে ঘুম। বালিশের পাশেই রেখেছি আরও দু-প্রস্থ শীতের পোশাক। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীত গাঢ় হলে ওই পোশাকগুলো গায়ে চাপাব।

বুক কেস থেকে জিম করবেটের একটা বই নিয়ে কিছুক্ষণ পড়লাম। তারপর পৌনে বারোটা নাগাদ ঘরের আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। ডক্টর সেনগুপ্তের শীতবোধ বেশ কম। তিনি দিব্যি পা ভাঁজ করে একটা শাল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন পোর্টম্যান্টোর ওপরে।

তখনও ঘুম আসেনি, হঠাৎই দরজায় ঠকঠক। খুলে দেখি আকোস্তা। মাছরাঙা পাখিটা নিতে এসেছে—সাহেবদের দেখাবে। ইলেকট্রোম্যাগনেট চেম্বার থেকে পাখিটা নিয়ে ওকে দিলাম। ও 'গুডনাইট' বলে চলে গেল। আলো নিভিয়ে আবার শুয়ে পড়লাম আমরা।

চার

পরদিন রবিবার। সকালবেলাতেই যন্ত্রপাতি নিয়ে গেলাম ডুলং নদীর দিকে। পয়েন্ট থেকে যে-রাস্তাটা মাহুরের দিকে গেছে সেই পথ ধরে কিলোমিটারখানেক গেলেই পাহাড়ী নদী ডুলং। নদীর দু-পাশে ঘন সবুজ ঝোপঝাড় আর নুড়ি-কাঁকর। নামে নদী হলেও আসলে স্রোতস্বিনী। বড় বড় পাথরের ওপর দিয়ে ছুটে চলেছে টলটলে স্বচ্ছ জলধারা। মাহুরের দিকে যাওয়ার জন্য নদীর ওপরে একটা লোহার ছোট সেতুও রয়েছে। শুনেছি, একরকম মোট ছ'টা সেতু আছে ডুলং-এর বিভিন্ন জায়গায়।

লোহার সেতুর ওপরে চুম্বকীয় মাপজোখ নেওয়া সম্ভব নয়। অতএব আমরা পিচের রাস্তা ছেড়ে ঝোপঝাড়ের মধ্যে দিয়ে ঢালু পথ বেয়ে নামতে শুরু করলাম।

একটু পরেই এসে গেলাম একেবারে ডুলং-এর কিনারায়। নদীটা এখানে বেশ চওড়া, আর উঁচু পাড়ে বেশ খানিকটা ফাঁকা জায়গাও রয়েছে। ফলে

মাপজোখের সুবিধেই হল।

চোখ বুজে থাকলে ডুলং-এর ঝমঝম শব্দ অনেকটা পুরীর সমুদ্রের মতো শোনায়। রাত্রিবেলা টাওয়ারে শুয়েও এই শব্দ আমাদের কানে গেছে। নদীর টলটলে জল দেখে স্নান করতে ইচ্ছে করছিল, কিন্তু প্রস্তুতি না থাকায় ইচ্ছেটাকে কাজে লাগানো গেল না।

ডুলং থেকে ফেরার পথে রাস্তায় দু-একটা পরিত্যক্ত উনুন চোখে পড়ল। উনুন বলতে তিনটে থান ইটে ঘেরা পোড়া কাঠকুটো। কাছাকাছি কয়েকটা পালকও দেখলাম। জানি না, আলোর ফাঁদে ধরা পড়া কোনও পাখিকে এখানে সদ্ব্যবহার করা হয়েছে কি না!

এখানেও পথের দু-পাশে যথারীতি পাহাড়ী টিবি ও জঙ্গল। মাঝে মাঝে দু-একটা পরিষ্কার জায়গায় রাস্তা-মেরামতী কর্মীদের অস্থায়ী ক্যাম্প চোখে পড়ল। ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে শুনলাম, এই রাস্তাগুলো প্রায়ই প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ফলে মেরামতের কাজটাও নিয়মিত দরকার হয়। কিছুদিন পরেই এ রকম দুর্যোগ দেখেছি, দেখেছি মেরামতী কর্মীদের লাগাতার পরিশ্রম।

পয়েন্টের কাছাকাছি এসে আকোস্তার সঙ্গে দেখা হল। শুনলাম, বনবিভাগের সাহেবসুবোরা প্রায় সকলেই চলে গিয়েছেন। আমি মাছরাঙা পাখিটার কথা জিজ্ঞেস করাতে আকোস্তা বলল, এক অফিসারের ছোট ছেলে খেলা করবে বলে নিয়ে গেছে।

গিরিনের দোকানে চা-পান পর্ব শেষ করে টাওয়ারে ফেরার পথে তিনজন পাঞ্জাবী যুবকের দেখা পেলাম। একজনের হাতে ছোট্ট ট্রানজিস্টর রেডিয়ো বাজছে। কিন্তু তাঁরা তিনজনেই রাস্তার দু-পাশের ঝোপঝাড় থেকে প্রজাপতি ও মথ সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। ওঁদের সঙ্গে আমাদের আলাপ হল। ওঁরা তিনজনেই ডক্টর সেনগুপ্তকে নামে চিনতে পারলেন। দলনেতা ডক্টর জগবীর সিং হাতে হাত মিলিয়ে বললেন, 'ও, যু আর দি ম্যান ডুয়িং রিসার্চ অন জাটিঙ্গা বার্ড মিস্ট্রি!'

কথায় কথায় জানলাম, ওঁরা এসেছেন চণ্ডীগড় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দু-জন রিসার্চ-ছাত্র ডক্টর জগবীর সিং-এর কাছে প্রজাপতি ও মথের ওপরে গবেষণা করছেন। ভারতের উত্তরপূর্ব পাহাড়ী অঞ্চলের বনসম্পদ ও প্রাণিসম্পদ প্রায় পুরোপুরি অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে আজও। আসলে অভিযানভিত্তিক গবেষণায় ঝুঁকি অনেক, পরিশ্রমও অনেক। সেইজন্যেই

হয়তো বহু গবেষক পিছিয়ে রয়েছেন। চণ্ডীগড়ে এখন উত্তর-পূর্ব অঞ্চল নিয়ে নতুন নতুন গবেষণা শুরু হয়েছে।

ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে সাক্ষাতের ঘটনাকে স্মরণীয় করে রাখতে বিকেলে আমাদের টাওয়ারে এসে একসঙ্গে ছবি তুললেন ডক্টর জগবীর সিং ও তাঁর ছাত্র দু-জন। চণ্ডীগড়ে গেলে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার জন্য বারবার আমন্ত্রণ জানালেন আমাদের। সন্দেহ নেই, এই সুভাষী বিদ্বান যুবক আমাদের কয়েকটা দিন উষ্ণ করে তুলেছিলেন।

বিকেলে মাপজোখ নেওয়ার জন্য গেলাম গ্রামের উচ্চতম বিন্দুতে। স্টেশনে যাওয়ার পথে এইদিক দিয়ে গেছি গতকাল। জায়গাটার সামনেই ডক্টর সেনগুপ্তের পরিচিত এক মহিলার বাড়ি। নাম মার্গারেট। ওঁদের বাড়িতে প্রচুর পাখি পড়ে। অতএব স্থানটির কোনও চুম্বকীয় গুণাগুণ আছে কি না সেটা জানতেই পরীক্ষার জন্য বিশেষ জায়গাটি বেছে নিয়েছেন ডক্টর সেনগুপ্ত। আমি মাপজোখের কাজ সারছিলাম, সেই ফাঁকে উনি মার্গারেটের দিদির সঙ্গে কুশল বিনিময় করে নানান খবরাখবর নিচ্ছিলেন।

ওঁদের বাড়ির সামনে মুগ্ধ হওয়ার মতো ফুলের বাগান। বাগান পেরিয়ে বিশাল উঠোন। সেখানেই প্রচুর পাখি পড়ে। না, এবারে ওঁরা কেউ আলো জ্বালেননি—ফলে পাখিও আসেনি।

আমাদের দ্বিতীয় মাপজোখের কাজ সারা হল মূর্তির কাছে। সেখান থেকে ফিরে এলাম টাওয়ারে। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'আজ রোববার, তাই রাত এগারোটা-বারোটার আগে পাখি শিকারের আয়োজন শুরু হবে না।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

ডক্টর সেনগুপ্ত হেসে জবাব দিলেন, 'এ-গ্রামের প্রায় সকলেই খ্রিস্টান। আজ রবিবার, ছুটির দিন। অতএব দোকানপাট থেকে শুরু করে সব বন্ধ—এমন কি পাখি ধরাও।'

বিকেল থেকেই কুয়াশা ছিল। সন্ধে গভীর হতেই তা আরও গাঢ় হল। অল্প অল্প বাতাস দিচ্ছিল। আবহাওয়া সঠিক হলেই ফেনোমেনন হতে পারে। রাত সাড়ে ন'টা পর্যন্ত টাওয়ারে বসেই কাটিয়ে দিলাম। তবে মাঝে মাঝে বারান্দায় এসে আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ করেছি। আবহাওয়া মোটামুটি অনুকূল মনে হচ্ছিল। অতএব পোশাক-আশাক পরে নিয়ে বেরোলাম বাইরে। অন্ধকার গ্রামের দিকে তাকিয়ে মাত্র দু-একটি আলো চোখে পড়ল। রবিবার

না হলে হয়তো অনেক বেশি আলো চোখে পড়ত।

গিরিনের ঘরে রাতের খাওয়া সেরে গেলাম তিন নম্বর টাওয়ারে। অন্ধকার রাস্তা থেকে দশ-বারো ধাপ সিঁড়ি উঠে গেছে দুটি ঘর পর্যন্ত। টিনের চালে ছাওয়া সাদা রঙ করা দুটি ঘর। এখনও বৈদ্যুতিক যোগাযোগ সম্পূর্ণ না হওয়ায় ঘর দুটি অন্ধকার। গতকাল জেনারেটার ও হ্যাজাক দিয়ে বনবিভাগের কর্তাব্যক্তিদের আপ্যায়নের কাজটুকু সারা হয়েছিল এখানেই।

ঘর দুটিকে পাশ কাটিয়ে আমরা অন্ধকার ডান-হাতি পথ ধরলাম। টর্চ জ্বেলে উঁচু-নিচু জমি পেরিয়ে খানিকটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছলাম। ডান দিকে দোতলা উঁচু টাওয়ার। টাওয়ারের বারান্দায় দিশেহারা পাখি আকর্ষণের আশায় জোরালো সার্চলাইট জ্বলছে। আকোস্তা আর পহেলো বোধহয় ওখানেই রয়েছে।

সামনেই ঢালু জমির প্রান্তে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি ছায়ামূর্তি—দুই খাসিয়া শিকারী। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, হাতে ছিপছিপে বাঁশের লাঠি, আর পায়ের কাছে জ্বলন্ত হ্যাজাক লণ্ঠন। এখনও পর্যন্ত কোনও শিকার ধরা পড়েনি।

আমরা এরপর এগিয়ে গেলাম টাওয়ারের কাছে। সিমেন্টের তৈরি চারটে পিলারের ওপরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি ঘর ও বারান্দা। পাশ দিয়ে সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। অতএব টর্চ জ্বেলে সিঁড়ি ভেঙে আমরা দোতলায় উঠে গেলাম।

মিনি জেনারেটারের শব্দ আগে থেকেই শোনা যাচ্ছিল। দোতলার ভেজানো দরজা খুলতেই শব্দটা যেন কানে এসে ধাক্কা মারল।

ছোট্ট ঘর। কাঠের দেওয়াল। মেঝেতে জ্যামিতিক নকশা কাটা লিনোলিয়াম। এক পাশে কেরোসিনের টিন হাতে পহেলো বসে রয়েছে—জেনারেটারের তদারকি করছে।

ঘর পেরোতেই ছোট্ট বারান্দা। বারান্দায় স্টিলের চেয়ার পেতে পাখির জন্য অপেক্ষা করছেন বেশ কয়েকজন মানুষ। সার্চলাইটের আলোয় উড়ে বেড়াচ্ছে অসংখ্য মথ ও পোকা। কোনও পাখির দেখা নেই। মাঝে মাঝে দু-একটা উড়ন্ত চামচিকে চোখে পড়ছে।

আমরা আকোস্তার এগিয়ে দেওয়া চেয়ারে বসে পড়লাম। আলাপ হল ডিভিশনাল ফরেস্ট অফিসার শ্রী এম. এন. অধিকারীর সঙ্গে। উনি নর্থ কাছাড় হিল্স্ ডিস্ট্রিক্ট-এ নতুন বদলি হয়ে এসেছেন। মিস্টার অধিকারী

ছাড়াও আরও দু-একজন বসে ছিলেন সেখানে। তাদের মধ্যে মহিলা এবং শিশুও ছিল। বুঝলাম, জাটিঙ্গার রহস্যময় পাখির আকর্ষণ স্বদেশেও কম নয়।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে আমরা বেরিয়ে পড়লাম টাওয়ার ছেড়ে। অনেকটা নগর পরিদর্শনে বেরোনোর মতো ঘুরে বেড়ালাম জাটিঙ্গার নানা জায়গায়।

ঝিঁঝির 'ডাক' সমানে চলছে। কুয়াশার বহর দেখে মনে হচ্ছে এই বুঝি বৃষ্টি নামল। বাতাসের শীতল ফোঁটা চোখে-মুখে টের পাচ্ছি।

হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম ইউ. এল. সুচ্যাঙের মূর্তি পর্যন্ত। পথে বহু শিকারীর দেখা মিলল। তবে শিকার এখনও হস্তগত হয়নি কারও। অবস্থা দেখেশুনে মনে হল ফেনোমেননের সম্ভাবনা কম। অতএব বাড়ির পথ ধরলাম।

রাস্তায় ডি. এফ. ও.-র জিপের দেখা মিলল। পাখি না দেখতে পেয়ে হতাশ হয়ে হাফলঙে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। আমরাও একরকম নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম টাওয়ারে। গতকালের মতো ব্যবস্থা করে শুয়ে পড়লাম। শুধু আমি কলকাতা থেকে সঙ্গে নিয়ে আসা কয়েকপ্রস্থ খবরের কাগজ বিছিয়ে দিলাম বিছানায়। গতকাল শীতে বেশ কষ্ট পেয়েছি। যতই রাত বেড়েছে ততই শীত যেন মেঝে থেকে চুঁইয়ে চুঁইয়ে আমার শরীরে এসে ঢুকেছে।

টিনের চালে শুকনো পাতা ঝড়ে পড়ার শব্দ হচ্ছিল—অনেকটা বৃষ্টির শব্দের মতো। তবে সত্যিকারের বৃষ্টি এল একটু পরেই। রাত তখন প্রায় বারোটা।

পাঁচ

পরের কয়েকটা দিন একইরকম মাপজোখের কাজে কেটে গেল।

রবিবার মাঝরাতে তিন নম্বর টাওয়ারে একটা পাখি ধরেছিল আকোস্তা, সোমবার সকালে আমাদের সেটা দেখাল। প্যারাডাইস ফ্লাইক্যাচার (বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Terpsiphone paradisi paradisi*) — বাংলায় শাহ্ বুলবুল বা দুধরাজ বলা হয়। উড়ন্ত পোকামাকড় ধরে খায় বলেই এদের নাম ফ্লাইক্যাচার। পাখিটা স্ত্রী-পাখি। কারণ প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ পাখির গায়ের রং আর ফিতের মতো লম্বা লেজের রং দুধের মতো সাদা হয়। এই পাখিটার ঝুঁটিওয়ালা মাথা গাঢ় নীলচে কালো, গায়ে বাদামী রং। গলা ও মাথার

দু-পাশটা ছাই রঙের। বেশ সুন্দর দেখতে। আর মাথা থেকে লেজের ডগা পর্যন্ত প্রায় আঠেরো-বিশ ইঞ্চি হবে। পরে আকোস্তা পাখিটা মিস্টার অধিকারীকে দিয়ে আসে। কিন্তু পাখিটা কোনও খাবার-দাবার মুখে না তোলায় মরে যাবে এই ভয়ে মিস্টার অধিকারী সেটিকে মুক্ত করে দেন। পরে তাঁর মুখ থেকেই এ-খবর পেয়েছিলাম।

ফেরার সময় এক খাসিয়া ভদ্রলোকের সঙ্গে ডক্টর সেনগুপ্তের দেখা হল। পিঠে শঙ্কু আকৃতির বেতের ঝুড়ি, কাঁধে দোনলা বন্দুক। তিনি চলেছেন তাঁর 'জুম', অর্থাৎ বাগান পরিচর্যার কাজে। বরাইল পাহাড়শ্রেণীর বিভিন্ন জায়গায় খাসিয়াদের বাগান আর চাষবাস। কমলালেবু, আদা, লঙ্কা, আনারস, তেজপাতা, কুমড়ো ইত্যাদি নানান জিনিস ফলায় তারা। জাটিঙ্গার মানুষের এটাই প্রধান জীবিকা। প্রতি শনিবার হাফলঙের বাজারে হাট বসে। সেখানে বাগানের ফসল বিক্রি করতে নিয়ে যায় সবাই। শনিবারে অফিস-কাছারি সকাল সকাল বসে, দশটায় ছুটি হয়ে যায়—ফলে ক্রেতা-বিক্রেতা উভয়েরই কেনাবেচার সুবিধে হয়।

প্রতিদিন সকালে দেখেছি মেয়ে, বুড়ো, বাচ্চা সব চানাচুরের ঠোঙার মতো বেতের ঝুড়ি পিঠে নিয়ে খালি পায়ে অথবা হাওয়াই চপ্পল পরে চলেছে পাহাড়ের দিকে, তাদের বাগানে। সারাদিন চাষবাসের তদারকির পর বাগানেই দুপুরের খাওয়া সেরে বিকেলে কি সন্ধের মুখে ঘরে ফেরে তারা। তখন বেশিরভাগেরই পিঠের ঝুড়ি ভরতি থাকে ফসলে। অবাক হয়ে দেখেছি, ঝুড়ির ফিতেটা কপালে লাগিয়ে পিঠে ভারি ভারি ওজন নিয়ে অবলীলায় চড়াই-উতরাইয়ের পথ ভেঙে প্রতিদিন এরা কী কঠোর পরিশ্রমই না করে! ওদের হান্টার শু লাগে না, লাগে না বিশ্রাম।

খাসিয়াদের 'জুম' বা বাগানে বন্যপ্রাণীর উৎপাত আছে। বুনো শুয়োর, ভল্লুক, উল্লুক ছাড়াও পাওয়া যায় হরিণ ও পাহাড়ী ছাগল। আত্মরক্ষা অথবা খাদ্য সংগ্রহের জন্য বন্যপ্রাণী শিকার করে তারা। যেমন এখন দোনলা বন্দুক কাঁধে এই শিকারী ভদ্রলোক চলেছেন। তাঁর কাছেই শুনলাম, হরিণ কদাচিৎ মারা পড়লে তার চামড়া চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকায় বিকোয়। অবশ্য, বেশিরভাগ খাসিয়াই চামড়া বিক্রি না করে নিজেদের ঘর সাজায়। যেমন বেতের মোড়া বাঁধিয়ে নেয় হরিণের চামড়ায়।

শিকারী ভদ্রলোকের বয়েস প্রায় ষাট, তবে চেহারা বেশ শক্তপোক্ত। আলাপ করতে করতে হাসিমুখে বললেন, 'দোনলা বন্দুক হলেও একসঙ্গে

দুটো গুলি করি না। একটা টোটা দাঁতে চেপে ধরে রাখি। প্রথমটা মিস হলে সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়টা ভরে নিয়েই ফায়ার করি।'

ব্যাপারটা অভিনয় করেও দেখালেন তিনি। লক্ষ করলাম, বয়েসের ভার তাঁর তৎপরতা কেড়ে নিতে পারেনি।

সোমবার সন্ধেবেলা গোগোই ফিরে এসেছে। রাতের খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা রোজকার মতো টহল দিতে বেরিয়ে পড়েছিলাম। ঘন কুয়াশা চারিদিকে। মাঝে মাঝে টর্চের আলো ফেলে দেখেছি, দিশেহারা দু-একটা পাখি উড়ছে। কিন্তু উপযুক্ত বাতাস না থাকায় ফেনোমেনন হল না। শুধু মূর্তির কাছে আমাদের টর্চের আলোয় একটা উড়ন্ত পাখি আকৃষ্ট হয়ে প্রায় নেমে পড়েছিল মাটিতে। অনেকক্ষণ এপাশ ওপাশ চক্কর খেয়ে পাখিটা শেষ পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে গেছে গাঢ় কুয়াশায়। পাখিটাকে আমরা চিনতে পারিনি।

মঙ্গলবার বিশ্বকর্মা পুজো। দোলনী ম্যাগনেটোমিটার নিয়ে আমরা তিনজনে গেলাম জাটিঙ্গা রেল স্টেশনে মাপজোখ করতে। দেখলাম রেল লাইনের ওপারে 'ইন্সপেক্টর অভ ওয়ার্কস, জাটিঙ্গা টানেল'-এর অফিসের বিশাল উঠোনে ম্যারাপ বেঁধে বিশ্বকর্মা পুজো হচ্ছে। দিব্যি ঢাক বাজছে।

মাপজোখের কাজ সেরে লাইন পেরিয়ে সেখানে গেলাম। একেবারে খাস কলকাতার মণ্ডপ যেন। তবে খানিকটা ঘরোয়া ভাব আছে। বাচ্চাকাচ্চারা ঘুরছে, খেলা করছে। থালায় থালায় ফলমূল, প্রসাদ। বয়স্করা নিবিষ্ট মনে পুজো দেখছেন। মনেই হচ্ছিল না কলকাতা থেকে হাজার-দেড় হাজার মাইল দূরে কোনও পাহাড়ী গাঁয়ে রয়েছি।

শরীর আবার বেঁকে বসায় গোগোই ফিরে গেল হাফলঙে। আর আমরা দোলনী ম্যাগনেটোমিটার দিয়ে পুরনো জায়গাগুলোতেই মাপজোখ করতে শুরু করলাম।

ডক্টর সেনগুপ্ত যে-সরকারি সংস্থায় যুক্ত সেখান থেকে জিপ আসার কথা ছিল। জিপে আসবেন তাঁর তিন সহকারী। জিপ না আসায় আমাদের কাজের গতি হয়ে পড়েছে খুব শ্লথ। কারণ প্রতিটি জায়গাতেই যন্ত্রপাতি বগলদাবা করে পায়ে হেঁটে যেতে হচ্ছে। তাছাড়া জাটিঙ্গা এলাকায় মাপজোখ নেওয়া শেষ হলে আমাদের যেতে হবে হারাঙ্গাজাও উপত্যকা, মাহুর ও লোয়ার হাফলঙ স্টেশনে—সেখানেও মাপজোখ নিতে হবে।

জাটিঙ্গা থেকে জায়গাগুলোর দূরত্ব যথাক্রমে ছত্রিশ, ছাব্বিশ ও আঠেরো কিলোমিটার। জিপ কলকাতা থেকে এসে না পৌঁছলে আমাদের হয়তো বাসে অথবা স্থানীয় জিপ ভাড়া করে কাজগুলো সারতে হবে। আর জিপ যদি ভাড়ায় না পাওয়া যায় তাহলে বাস ছাড়া গতি নেই। কিন্তু বাসে করে এই যন্ত্রপাতি অক্ষত অবস্থায় জায়গামতো পৌঁছবে তো! আমার যথেষ্ট সন্দেহ ছিল সে-ব্যাপারে।

মঙ্গলবার রাতে হালকা কুয়াশা ছিল অথচ চাঁদ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছিল। ফলে ফেনোমেনন হয়নি। তবে গভীর রাত পর্যন্ত পাখির চিক-চিক ডাক শুনতে পেয়েছিলাম।

পরদিন গোগোইয়ের ফিরে আসার কথা ছিল, কিন্তু ও এল না। হয়তো এখনও সুস্থ হয়নি। আমরা পুরনো সব জায়গায় মাপজোখের কাজ সেরে রওনা হলাম নতুন দিকে। নতুন দিক বলতে পয়েন্ট থেকে যে-রাস্তাটা শিলচরের দিকে এগিয়ে গেছে সেদিকে হাঁটা শুরু করলাম।

আঁকাবাঁকা রাস্তা। ডান দিকে খাদ আর জঙ্গল। বাঁ দিকে উঁচু পাহাড়। পাহাড়ে বাঁশবন আর অসংখ্য গাছপালা ঝোপঝাড়। রাস্তার একটা ঘোরালো বাঁকের মুখে একটি মজাদার সাইনপোস্ট চোখে পড়ল। হলুদের ওপরে কালো রঙে একটি কেশবতী যুবতীর বুক পর্যন্ত আঁকা। তার নিচে ইংরেজিতে লেখা : বি জেন্টল অন মাই কার্ভস্। এবং তার পরের লাইনে ছোট করে 'ওয়েলকাম' শব্দটি লেখা রয়েছে। এই উপদেশ নিঃসন্দেহে বেপরোয়া মোটর-চালকদের প্রতি, তবে লেখকের রসবোধের প্রশংসা করতে হয়। বিশেষ করে শহর থেকে দূরে এই পাহাড়ী গাঁয়ে এই রসবোধের কথা ভাবা যায় না!

চলতে চলতে দেখি এক জায়গায় পথের ধারে প্রচুর সবুজ তেজপাতা ছড়িয়ে রাখা হয়েছে শুকোনোর জন্য। দুজন লোক বস্তায় তেজপাতা ঠেসে ভরতি করছিল। আগ্রহ প্রকাশ করতেই একরাশ সবুজ তেজপাতা উপহার পেলাম।

আরও কিছুটা পথ এগিয়েছি, হঠাৎই পাহাড়ের ওপর থেকে ভেসে এল অদ্ভুত ডাক। যেন একদল হনুমান হল্লা করছে। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'ওগুলো উল্লুকের ডাক। মাউন্ট হেম্পিওর ওপাশে থাকে। এই সময়টা পাহাড় ডিঙিয়ে এপিঠে খেতে আসে। আমার এক সহকর্মী এদের কথা আমাকে বলেছিল।'

প্রায় দু-কিলোমিটার হেঁটে যাওয়ার পর একটা জায়গা বেছে নিয়ে আমরা মাপজোখের কাজ শেষ করলাম। তারপর খুশি মনে টাওয়ারে ফিরে এলাম।

কিন্তু এই খুশি বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। কারণ দিবানিদ্রা সেরে বিকেলে মাপজোখের কাজে বেরোতে গিয়েই দেখি সর্বনাশ! দোলনী ম্যাগনেটোমিটারে চুম্বক বসানোর তামার রেকাবটি একটি সিল্কের সুতো দিয়ে ঝোলানো থাকে—তা সেই সুতোটি কোন আগ্রহী এবং কৌতূহলী দর্শক ছিঁড়ে রেখে গেছে। এখন সুতো কোথায় পাই!

আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো চাচাদের ঘরে বড় টেবিলের ওপরে সাজানো থাকত। ঘরের দরজা সব সময়েই খোলা থাকে। তার ওপর গাঁয়ের বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা প্রায়ই আগ্রহ নিয়ে ভিড় করে যন্ত্রপাতিগুলো দেখতে আসে। নিজেদের মধ্যে নানান কথা বলে। হয়তো তাদেরই কেউ এই সর্বনেশে কাণ্ডটি করেছে।

সুতরাং পরদিন সকালে আমি হাফলঙ রওনা হলাম সিল্কের সুতোর সন্ধানে।

১৯ তারিখে ভোর সাড়ে ছ-টায় মূর্তির কাছ থেকে জিপ ধরে হাজির হলাম হাফলঙে। সেখানে পৌঁছে প্রথমেই ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গেস্ট-হাউসে গেলাম গোগোইয়ের সন্ধানে। কিন্তু দেখি ছ'-নম্বর ঘর বন্ধ। গোগোই নেই। হয়তো সকালবেলার শিলচরগামী বাস ধরে রওনা হয়ে গেছে জাটিঙ্গার দিকে। সুতরাং সুতোর সন্ধানে এবারে বাজারের দিকে এগোলাম।

ডক্টর সেনগুপ্তর কাছে শুনেছিলাম এখানে মাছ অগ্নিমূল্য। বাংলাদেশ থেকে কিছু কিছু চালান আসে। বাজারে গিয়ে হাতে-কলমে সে-প্রমাণ পেলাম। শিঙ্গি-মাগুর সত্তর টাকা কিলো। ভালো পোনা মাছ ষাট টাকা। আর নিম্নমানের ইলিশ—অর্থাৎ সরু এবং ঠোঁট কালো—পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ। তবে মাছ দুর্মূল্য হলেও ডিম তিন টাকা জোড়ায় পাওয়া যায়। গিরিনের দোকানে আমিষ আহার করলে ডিমই হাজির থাকে নানা রূপে ঃ কখনও ডালনা, কখনও সেদ্ধ, আবার কখনও ওমলেট। একমাস জাটিঙ্গায় বাস করে মাত্র একদিন আমরা ইলিশ মাছের স্বাদ পেয়েছি—আর তাও গিরিনের আগ্রহ ও চেষ্টায়।

এমনিতে হাফলঙের বাজার বেশ জমজমাট। শনিবারে—হাটবারে—তা আরও জম্পেশ হয়ে ওঠে। পিচের রাস্তা থেকে দশ-বারো ধাপ সিঁড়ি উঠে সমতল জমিতে দোকানপাট-বাজার। সেখানে মাছ-তরিতরকারির পাশাপাশি চায়ের দোকান, মনোহারী দোকান, টেলারিং, কাপড়ের দোকান, পান-বিড়ি-সিগারেট ইত্যাদি সবকিছুই কেনাকাটার ব্যবস্থা আছে।

পাঁচ-ছ'টা দোকানে খোঁজ করার পর অবশেষে একটি কাপড়ের দোকানে সিল্কের সুতো পাওয়া গেল। দাম মাত্র পঞ্চাশ পয়সা। কিন্তু সংগ্রহের পরিশ্রম ও ভোগান্তির কথা ভাবলে তেতো হাসি ফুটে ওঠে ঠোঁটে। তবে পাওয়া যে গেল এটাই ভাগ্য! নইলে বাকি মাপজোখের কাজ সব পণ্ড হয়ে যেত।

সুতো কিনে নীচের রাস্তায় নেমে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডের দিকে কিছুটা এগিয়েছি, হঠাৎ দেখি রাস্তায় লোকজন ছোটাছুটি করছে। একজনকে জিজ্ঞেস করে জানলাম বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে বাজারে আগুন লেগেছে। কোথায়? না একটা দোকানে—যেখান থেকে একটু আগেই আমি সুতো কিনেছি।

ছুটে যখন বাজারে আবার পৌঁছলাম তখন বিশৃঙ্খলা তুঙ্গে। বাজারের বাঁ দিকটায় টিনের চালা দেওয়া কয়েকটা দোকানঘর থেকে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে লাল আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠছে। লোকজন ছোটাছুটি করছে, চিৎকার করছে, যুবকেরা বালতি হাতে দৌড়চ্ছে। তারই মাঝে ছ'-সাতটা ভেড়া দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খাচ্ছে আর করুণ স্বরে ডাকছে। একটু আগেই এই অবোলা প্রাণীগুলোকে নিশ্চিন্ত মনে ঘাস চিবোতে দেখেছি।

দমকলের একটি গাড়ি এসে আগুন মোটেই আয়ত্তে আনতে পারছিল না। তা নিয়ে বেশ কিছুটা উত্তেজনার সৃষ্টি হল। সামনেই দাঁড়িয়ে একটা ঝুপসি বটগাছ। সেটার সবুজ পাতা আগুনের আঁচে পুড়ে কালো হয়ে যেতে লাগল। দোকানদাররা তাদের মালপত্র সরিয়ে এনে ডাঁই করে রাখছে খোলা জায়গায়। একজন দোকানীকে দেখলাম সস্ত্রীক কপাল চাপড়ে কাঁদছে। আর-একজন পাগলের মতো ছুটে যেতে চাইছে তার জ্বলন্ত দোকানে—কয়েকজন তাকে জোর করে জাপটে ধরে রেখেছে। হইহই, চেঁচামেচি, ছুটোছুটি তখনও এতটুকু কমেনি।

প্রায় ছ'টা বড় বড় দোকান ধ্বংস করার পর জিপে করে বয়ে নিয়ে আসা ফায়ার এক্সটিঙ্গুইশার দিয়ে আগুনকে আয়ত্তে আনা গেল। কিন্তু ততক্ষণে ক্ষতি যা হওয়ার হয়ে গেছে। উপরন্তু আশপাশের ও নীচের রাস্তার বহু দোকানী আগুন ছড়িয়ে পড়তে পারে এ আশঙ্কায় তাদের দোকানের সমস্ত মালপত্র বাইরে বের করে ফেলেছে।

নীচের রাস্তায় নেমে যে-দৃশ্য দেখেছি তা সহজে ভোলা যাবে না। রাস্তা ভরতি হরেকরকম জিনিসপত্রের টাল। আর তার পাশে পাশে দাঁড়িয়ে নানা দোকানী-পরিবার। তাদের অনেকেই হা-হুতাশ করে কাঁদছে। পরিবারগুলোর বেশিরভাগই বাঙালি। কোনও সময়ে তারা হয়তো পশ্চিমবঙ্গ অথবা প্রাক্তন পূর্ববঙ্গ থেকে এসে বসবাস-ব্যবসা শুরু করেছিল উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার এই হাফলঙে। আজ এই দুর্ঘটনা তাদের অনেককেই নিঃস্ব করে দিয়েছে। এখন ওরা ঠিক যেন নিরাশ্রয় শরণার্থী — সর্বস্বান্ত কয়েকটি পরিবার। চোখে তাঁদের শূন্য দৃষ্টি। গালে অশ্রু-রেখা।

পুলিশ যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিয়েছিল অনেক আগেই। সুতরাং জাটিঙ্গার দিকে কোনও বাস বা ট্যাক্সি যাবে না এখন। ফলে সুতো পকেটে নিয়ে হাঁটতে শুরু করলাম। পথে যদি কোনও গাড়িতে লিফ্‌ট পাই তা হলে ভালো, নইলে পদব্রজ ভরসা। চলার পথে অসহায় পরিবারগুলোর করুণ মুখ আমার চোখের সামনে ভাসছিল। স্বদেশে সর্বস্বান্ত হওয়া এক জিনিস, কিন্তু প্রবাসে? জানি না, এর চেয়ে কঠোর কোনও শাস্তি নিয়তি দিতে পারে কি না।

কপাল আমার ভালোই বলতে হবে, কারণ একটা জাটিঙ্গামুখী জিপকে বুড়ো আঙুল দেখাতেই গাড়িটা থামল। এখানে নিয়মিত যানবাহনের অভাব থাকায় সকলেই সকলকে প্রয়োজনে লিফ্‌ট দেয়—অন্তত দিনের বেলায়। সুতরাং জিপে উঠে পড়লাম। এক কিলোমিটারটাক বাহন পাওয়া গেল। তারপর জিপটির যাত্রা শেষ এবং আমারও পদ-অবনতি।

আধঘণ্টা মতো হেঁটে চলার পর আবার লিফ্‌ট পেলাম আরেকটি জিপে। দ্বিতীয় লিফ্‌ট আমাকে পৌঁছে দিল জাটিঙ্গার তিন-চার কিলোমিটারের মধ্যে। তারপর বাকি পথটা হেঁটেই সেরে দিলাম। অবশ্য ঝাঁঝাঁ রোদ্দুরে হাঁটতে রীতিমতো কষ্ট হচ্ছিল। কিন্তু নিরুপায় অবস্থায় পড়লে কোনও কষ্টকেই গ্রাহ্য করা যায় না।

টাওয়ারে ফিরে দেখি গোগোই হাজির। আমার অনুমানই সত্যি হয়েছে—সাতসকালেই ও রওনা দিয়েছে জাটিঙ্গার দিকে। বেলা অনেক হয়ে গিয়েছিল, অতএব স্নান-খাওয়া সেরে বিশ্রামে গা এলিয়ে দিলাম ভূমিশয্যায়। বিকেলবেলা কিনে আনা সুতো দিয়ে দোলনী ম্যাগনেটোমিটারকে কার্যকরী করে তিনজনে বেরিয়ে পড়লাম মাপজোখের কাজে। পুরনো রাস্তা ধরে গির্জার পাশ দিয়ে এগোলাম রেল স্টেশনের দিকে।

পথে একটা অদ্ভুত ঘটনার সাক্ষী হতে হল। জঙ্গলের রাস্তায় হঠাৎই

দেখি কয়েকটা বাচ্চা ছেলে প্রচণ্ড উত্তেজনায় 'উলি, উলি!' বলে ছুটোছুটি করছে। ব্যাপারটা কী? কয়েকটা ছেলের হাতে টিনের কৌটো, কারও বা হাতে পলিথিনের প্যাকেট। ওদের কয়েকজন বেপরোয়া হয়ে পাহাড়ের আগাছা-ভরা ঢালে ঝাঁপ দিল। সরসর করে নেমে গেল অনেকটা নীচে। তারপর ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকেই হাতড়ে হাতড়ে কী সব নিয়ে ভরতে লাগল কৌটোয় আর প্যাকেটে।

লক্ষ করলাম, জঙ্গলে ওদের হুড়োহুড়ির জায়গা থেকেই অসংখ্য ডানাওয়ালা লাল পিঁপড়ে পিলপিল করে উড়ে আসছে বাতাসে। ছেলেগুলো তখনও দুরন্ত বেগে পিঁপড়ে সংগ্রহ করে চলেছে।

ডক্টর সেনগুপ্তকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতেই উনি বললেন, 'এ সময়টা এই জাতের পিঁপড়ের প্রজনন ঋতু। তবে ওরা বোধহয় খাওয়ার জন্যেই ওগুলো কৌটোয় ভরছে।'

আমাদের কাছাকাছি এক খাসিয়া কিশোরী দাঁড়িয়ে ছিল। ডক্টর সেনগুপ্তের কথা ওর কানে গেল। মেয়েটি কী ভাবল কে জানে। ফিক করে একটু হেসে পালিয়ে গেল বাড়ির ভেতরে।

আমাদের নিয়মমাফিক কাজকর্ম শেষ হওয়ার পর সন্ধেবেলা গোগোই আবার ফিরে গেল হাফলঙে। আকাশে চাঁদ ছিল। অতএব এলোমেলোভাবে সময় কাটিয়ে রাতে নিশ্চিন্ত মনে এসে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

আমাদের মাপজোখের কাজ চলছে তো চলছেই। নিশ্চিত ফল জানার জন্য একই জায়গায় বারবার আমরা পরীক্ষা চালিয়েছি। শুক্রবারও নিয়মমাফিক কাজের হেরফের হল না। সকালে কুয়াশা ছিল না, তবে মেঘ ছিল। বরাইল পাহাড়ের কালো কালো চূড়ায় থোকা থোকা মেঘ জমে আছে। ঠিক যেন একটা কালোকোলো বাচ্চা ছেলে এলোমেলো পাউডার মেখে বসে আছে।

জাটিঙ্গা গ্রামটি টিবির মতো, আর তার আশেপাশে গভীর খাদ—অবশ্য দার্জিলিং বা কাশ্মীরের মতো গভীর নয়। সেই খাদের পরই বরাইল পাহাড়ের দেওয়াল ঘেরাটোপের মতো অঞ্চলটিকে প্রায় ঘিরে রেখেছে। শুধু মাত্র দক্ষিণ-পশ্চিম দিকটা খোলা। সেদিকে খাদ বরাবর তাকালে দিগন্তের অস্তগামী সূর্যকে বেশ কিছুক্ষণ দেখা যায়। এসব কথা বলার কারণ, চলমান মেঘ ও কুয়াশার ধরনধারণ এ থেকে সহজে বোঝা যাবে। দিনের পর দিন দেখেছি, কুয়াশা ও জলদমেঘ পশ্চিম দিকের নালার মতো খাদ বরাবর ভেসে আসে জাটিঙ্গার দিকে। তারপর তারা বরাইল পাহাড়ের দেওয়ালে

ঘেরা বাটির মতো খাদে বন্দি হয়। সেখানে কুয়াশার চাপ ক্রমশ বাড়ে। বাড়তে বাড়তে একসময় বাটির কুয়াশার চাপ নালা বরাবর বয়ে আসা কুয়াশার চাপের সঙ্গে সমান হয়। তখন সমস্ত কুয়াশা ও মেঘ জড়ভরত হয়ে জাটিঙ্গাকে ছেয়ে রাখে। কোনও কোনও সময় এই অবস্থা থাকে কয়েকদিন ধরে। তখন লক্ষ করলে দেখা যাবে, ক্ষীণ কুয়াশার নগণ্য স্রোত বরাইল পাহাড়ের দেওয়াল ডিঙিয়ে ওপারে চলে যাচ্ছে।

কুয়াশাবৃত এই অবস্থার মধ্যে হয়তো চলতে থাকে বিদ্যুৎ-মোক্ষণ। ভূতলের খুব কাছাকাছি এই মোক্ষণক্রিয়া ঘটায় তার প্রভাবে প্রভাবিত হতে পারে জাটিঙ্গার ভূচৌম্বক ক্ষেত্র—এবং অবশেষে প্রভাবিত হয় খাদের জঙ্গলনিবাসী ঘুমন্ত পাখিরা। তারা সচকিত হয়, উড়ে পড়ে কুয়াশা ঘেরা অন্ধকার রাতে। অন্ধ দিশেহারাভাবে উড়তে উড়তে তারা আলো দেখে ছুটে যায় স্বস্তির আশায়—কারণ তারা দিনের পাখি, নিশাচর নয়।

আলোর ফাঁদে জাটিঙ্গায় এ পর্যন্ত যেসব পাখি ধরা পড়েছে, তার সবই দিনের পাখি। সুতরাং দিনের বেলা বা চন্দ্রশোভিত রাতে চৌম্বকক্ষেত্রের তারতম্য বা চঞ্চলতা ঘটলেও গ্রামে পাখি পাওয়ার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। কারণ দিনের বেলা পাখিরা দিব্যি দেখতে পায়, অতটা ভয় পায় না মোটেই। তাছাড়া সে-সময় তারা খাওয়া-দাওয়া ওড়াউড়ির কাজে ব্যস্ত থাকে। আর রাতে ঘুমনোর জায়গা ছেড়ে যখন তারা উড়ে পড়ে, তখন আকাশে চাঁদ থাকলে দিশেহারা ভয়ে তারা উড়ে যায় চাঁদের দিকে—অর্থাৎ ওপর দিকে। ফলে জাটিঙ্গা গ্রামে আলোর ফাঁদ পাতলেও পাখি আসে না।

এই ব্যাখ্যার এখনও সরাসরি প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অতএব এটিকে প্রকল্প হিসেবেই গণ্য করতে হবে। জাটিঙ্গা ও তার আশেপাশে ভূচৌম্বকক্ষেত্রের মান নির্ণয় করে কিছুটা অসম বণ্টন আমরা লক্ষ করেছি, যা থেকে বলা যেতে পারে ওই অঞ্চলের চৌম্বকবলরেখার বিন্যাস সুষম নয়। সম্ভবত এই অসম বিন্যাসও রাতে পাখিদের 'ঘর ছাড়া' করার ব্যাপারে অংশ নিয়ে থাকে। আরও সূক্ষ্মতর যন্ত্রাবলী নিয়ে আরও ব্যাপক মাপজোখের কাজ করার ইচ্ছে আছে আমাদের। হয়তো তখনই আরও নিশ্চিতভাবে এই প্রকল্পকে সমর্থন করা যাবে।

পাখির সমস্যাটির প্রথম দুটি অংশের সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারলেও শেষ অংশটির কোনও সমাধান এখনও করে উঠতে পারেননি ডক্টর সেনগুপ্ত। অর্থাৎ, শুধুমাত্র জাটিঙ্গাতেই কেন আসে পাখিরা। আশা করা যায় আগামী কয়েক বছরের মধ্যেই হয়তো তিনি এর কোনও যুক্তিসঙ্গত

উত্তর খুঁজে পাবেন।

এছাড়া আলোর আকর্ষণে ছুটে আসা পাখিদের 'সম্মোহিত' অবস্থার কারণ সম্পর্কেও প্রশ্ন করেছিলাম তাঁকে। উত্তরে তিনি বলেছেন, 'যেসব পাখি এখানে পাওয়া গেছে সেগুলো সাধারণত জঙ্গলের পাখি, বুনো পাখি। এরা সবসময় মানুষকে এড়িয়ে চলতে চায়। মানুষের বসতির ধারে কাছে এরা বলতে গেলে আসেই না। ফলে সেই সব পাখিরা যখন আলোর টানে মানুষের হাতে এসে পড়ে তখন তাদের ফিজিওলজিক্যাল রিয়্যাকশন অন্যরকম হয়ে যায়—অনেকটা শকের মতো। তাই তারা স্বেচ্ছায় খেতে চায় না, অনেকে উড়ে পালানোর চেষ্টাও করে না। সম্পূর্ণ অপরিচিত পরিবেশে এসে ওরা যেন হতবুদ্ধি হয়ে যায়।'

এর মধ্যে বেশিরভাগ পাখিকেই নিত্যকার জীবনযাত্রায় জাটিঙ্গার মানুষরা কখনও দেখেনি। ফলে তাদের অনেকের ধারণা, সেই না-দেখা পাখিগুলো পরিযায়ী পাখি—ভিন দেশ থেকে উড়ে এসেছে। কিন্তু ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, না, এরা সবই স্থানীয় পাখি—অর্থাৎ, এই সময়টায় এরা উত্তর কাছাড় পার্বত্য জেলার জঙ্গলে-পাহাড়ে বাস করে। পরে ডক্টর সালিম আলি ও ডিলন রিপলি-র 'কমপ্যাক্ট হ্যান্ডবুক অভ দ্য বার্ডস অভ ইন্ডিয়া অ্যান্ড পাকিস্তান' বইটিতে আলোয় ধরা পড়া সব পাখিরই ছবি ও পরিচয় খুঁজে পেয়েছি।

ছয়

শুক্রবার বিকেলে দেখলাম, একটি রক্তাক্ত মৃত শুয়োরকে কয়েকজন মানুষ বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, জন্তুটিকে 'জুমে' পাওয়া গেছে—গুলি করে শিকার করা হয়েছে। গত সোমবারে দেখা বন্দুক কাঁধে শিকারী ভদ্রলোকের মুখটা ভেসে উঠল আমার চোখের সামনে।

টাওয়ারে ফিরে সন্ধেবেলা আকোস্তার দেখা পেলাম। কোনও কাজ ছিল না, তাই ওর সঙ্গে নানান বিষয় নিয়ে গল্প জুড়ে দিলাম।

আকাশে চাঁদ চকচক করছে, কিন্তু কুয়াশাও গুড়ি মেরে জমতে শুরু করেছে। বলা যায় না, কোনও এক সময়ে চাঁদ ঢেকে দিতে পারলেই হয়তো পাখির ঝাঁকের দেখা মিলবে। প্রায় প্রতি রাতেই সার্চলাইট জ্বেলে তিন নম্বর টাওয়ারে পাখির জন্য অপেক্ষা করে আকোস্তা, পহেলো ও টমাস।

ওরা বনদপ্তরের লোক। সিজন্ টাইমে টাওয়ারে আলো জ্বেলে বসে থাকাটা ওদের ডিউটির মধ্যেই পড়ে হয়তো। আলোয় ধরা পড়া পাখির ওপর তড়িৎ-চুম্বক দিয়ে পরীক্ষা করার পরিকল্পনা ছিল আমাদের। তড়িৎ-চুম্বকের প্রকোষ্ঠটা মাপে খুব বড় নয়। সুতরাং ছোট মাপের পাখি পেলেই বেশি সুবিধে। আকোস্তাকে প্রয়োজনটা জানালেন ডক্টর সেনগুপ্ত। ও বলল, পেলে নিশ্চয়ই দেবে। তারপর আগামী ৪ অক্টোবরের সেমিনারের প্রসঙ্গ তুলল। এই তথাকথিত 'সেমিনার'টির কথা ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে আগেই শুনেছিলাম। সে সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন।

সকলেই জানেন, 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী সংস্থা' নামে একটি সংগঠন আছে। তাঁরা বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ইত্যাদি নিয়ে সারা পৃথিবী জুড়েই নানা কাজ করছেন। মুনাফালোভী শিকারী ও কালোবাজারিদের হাত থেকে বন্যপ্রাণীদের রক্ষা করছেন। ১৯৮১-৮২ সালে এই সংগঠনের সভাপতি ছিলেন ইংল্যান্ডের ডিউক অভ এডিনবার্গ। সেই সময়ে জাটিঙ্গার পাখি এবং আলোর ফাঁদ পেতে তার শিকারের ঘটনা জানিয়ে জনৈক পক্ষীপ্রেমী অসমের একটি দৈনিকে চিঠি লেখেন। পাখিদের এই গণহত্যা বন্ধের ব্যাপারে ব্যবস্থা নিতে তিনি অনুরোধ করেন।

এই চিঠির প্রতি ডিউক অভ এডিনবার্গের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। তখন তিনি চিঠি লেখেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে। অনুরোধ করেন এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে। সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী একটি সুন্দর ব্যবস্থা নেন। জাটিঙ্গার মানুষরা যাতে পাখিদের ভালোবাসতে শেখে, যাতে তারা উপকারী বন্ধু হিসেবে পাখিদের চিনে নিতে পারে, নেহাতই স্থূল প্রয়োজনে তাদের হত্যা না করে, তার জন্য জাটিঙ্গায় 'সেভ জাটিঙ্গা বার্ডস্' নামে একটি বাৎসরিক সেমিনারের আয়োজন করতে সরকারি কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন। এই উপলক্ষে প্রথম সেমিনার হয় ১৯৮২ সালে। সেমিনারের নামকরণ নিয়ে স্থানীয় মানুষের মধ্যে কিছুটা অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। তাদের অনেকের বক্তব্য, 'না মারলেও পাখিগুলো তো এমনিতেই অনশনে মারা যাবে, তাহলে...' কিন্তু হ্যাজাকের আলো জ্বেলে ফাঁদ না পাতলেই যে সমস্যাটির সমধান হয়ে যায় সে-কথা অবশ্য কেউ তোলেনি। আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আইন অনুযায়ী ভারতের সবরকম বন্যপ্রাণীই সংরক্ষিত। প্রয়োজনীয় অনুমতি ছাড়া প্রাণীসম্পদ নষ্ট করলে আইনত তা দণ্ডনীয়। তাছাড়া ভারতের পাখির বেশ কয়েকটি প্রজাতি এখন অবলুপ্তির পথে। বেপরোয়া শিকারই যে তার জন্য

দায়ী নয় সে-কথা কে হলফ করে বলতে পারে!

প্রতি বছর অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহটিকে 'বিশ্ব বন্যপ্রাণী সপ্তাহ' হিসেবে পালন করা হয়। সেই কারণেই জাটিঙ্গার সেমিনারটিও ওই সপ্তাহের কোনও একদিন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ ও ১৯৮৪-তে সেমিনার হয়নি বলেই শুনলাম। এবারে, অর্থাৎ ১৯৮৫-তে, অক্টোবরের ৪ তারিখটিকেই সেমিনারের দিন হিসেবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

সেমিনারের কথা বলে আকোস্তা চলে গেলে পর ডক্টর সেনগুপ্ত ওর সম্পর্কে বলছিলেন। এরকম পরোপকারী অথচ হাসিখুশি ছেলে পাওয়া ভার। ম্যাট্রিক পাশ করেছে, পাখি সম্পর্কে আগ্রহ আছে, খোঁজখবর রাখে। ওর সঙ্গী পহেলাও ডক্টর সেনগুপ্তকে কম সাহায্য করেনি। জাটিঙ্গায় প্রথম আসার সময় থেকেই এই দুই যুবক নিঃস্বার্থভাবে তাঁকে সাহায্য করে এসেছে। এমন কি নিজেদের বিপন্ন করেও তাঁকে নিরাপদ রেখেছে।

এতক্ষণ এক নম্বর ও তিন নম্বর টাওয়ারের কথা বলেছি, দু-নম্বর টাওয়ার সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। তিন নম্বর টাওয়ার থেকে এক নম্বরে যাওয়ার পথে পিচের রাস্তার ডান দিকে জাটিঙ্গা হাসপাতাল। রাস্তা থেকে খানিকটা উঁচুতে বিশাল সবুজ মাঠ। আর তার গায়ে টিনের চালে ঢাকা কয়েকটা ঘর নিয়েই হাসপাতাল। হাসপাতালের কিছুটা পরেই দু-নম্বর টাওয়ারের সাইনবোর্ড লাগানো রয়েছে। সাইনবোর্ডের আশেপাশে আগাছার জঙ্গল। তারই ভেতর দিয়ে সিঁড়ির এবড়োখেবড়ো ধাপ নেমে গেছে নীচে। প্রায় ফুট পনেরো-কুড়ি নামলে যে-জায়গায় পৌঁছনো যায় সেটা কবরখানা—জাটিঙ্গার খ্রিস্টান মানুষদের সমাধিক্ষেত্র। বিঘে দেড়-দুই সমতল জায়গাটার সর্বত্রই আগাছা ও জঙ্গল। তার পরেই খাদ আরও গভীর হয়েছে, জঙ্গলও গভীরতর। ওপর দিকে চোখ তুললে দেখা যায় বরাইল শৈলমালার আঁকাবাঁকা রেখা।

কবরখানার সমতল জমিতে একপাশে কিছুটা জায়গা সাফ করে চারটে পিলারের ওপরে দাঁড় করানো রয়েছে দু-নম্বর ওয়াচ-টাওয়ার—ছোট্ট একফালি বারান্দাওয়ালা একটা কাঠের ঘর। এক সময়ে গুরুত্ব পেলেও এখন পরিত্যক্ত। এখন বনদপ্তরের কর্তাব্যক্তিদের সবচেয়ে প্রিয় টাওয়ার পয়েন্টের তিন নম্বর টাওয়ার—যত কর্মব্যস্ততা এখন তাকে ঘিরেই। কিন্তু ফেনোমেননের সময়ে কবরখানায় পাখি পড়ে প্রচুর। তাই সরকারি তরফে অবহেলা পেলেও গ্রামবাসীদের কাছে কবরখানা অঞ্চলটি পাখি ধরার পক্ষে বেশ জনপ্রিয়। এসে থেকেই দেখেছি হ্যাজাক ও বাঁশের লাঠি হাতে

শিকারীর দল কুয়াশা ভেদ করে নেমে যাচ্ছে কবরখানার দিকে। বছরকয়েক আগেও কবরখানায় নামার কোনও সিঁড়ি ছিল না। সিঁড়ি তৈরি হয়েছে দু-নম্বর ওয়াচ-টাওয়ারের জন্মের সময়ে। এর মধ্যে একদিন সকালে দু-নম্বর টাওয়ারে আমরা ঘুরে এসেছি। তখন ডক্টর সেনগুপ্ত কয়েকবছর আগের কথা বলছিলেন। কুয়াশা ঘেরা বৃষ্টির দুর্যোগময় এক রাতে আকোস্তা ও পহেলা তাঁকে একরকম কাঁধে করে পিছল ঢাল বেয়ে নামিয়েছিল কবরখানায়। উনি কবরখানায় গিয়েছিলেন সরেজমিনে ফেনোমেনন পর্যবেক্ষণের জন্য। পাহাড়ীদের কাছে কোনও পথই দুর্গম নয়। কাজের শেষে ওরাই অবলীলায় আবার তাঁকে পৌঁছে দিয়েছিল পিচের রাস্তায়। আকোস্তা ও পহেলা সত্যিই দুই হিরের টুকরো। কুয়াশা-ঢাকা অন্ধকার রাতেও ওদের দ্যুতি ঠিকরে বেরোয়।

রাত বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে কুয়াশাও বাড়ছিল। চিক-চিক শব্দে পাখির ডাক শোনা যাচ্ছিল আবার। ভিজে বাতাস হু-হু করে ঠাণ্ডা ভাসিয়ে নিয়ে আসছিল। মনে হচ্ছিল বৃষ্টি নামবে।

শনিবার খুব ভোর থেকেই বৃষ্টি শুরু হল। সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশা। পাঁচ হাত দূরে নজর চলে না। মনে বেশ আশা জাগল যে, আজ ফেনোমেননের উপযুক্ত আবহাওয়া হতে পারে।

একটু পরে গোগোই এল হাফলঙ থেকে। ডক্টর সেনগুপ্তের কিছু চিঠিপত্র এসেছিল হাফলঙে, সেগুলো ও নিয়ে এসেছে। জাটিঙ্গায় চিঠিপত্র আসার কোনও ব্যবস্থা নেই। চিঠিপত্র সবই এসে পৌঁছয় হাফলঙের ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল অফিসে। সেখানে গিয়ে খোঁজ করে নিয়ে আসতে হয়।

গোগোই আসার পর এক নম্বর টাওয়ারে বসেই দোলনী ম্যাগনেটোমিটার নিয়ে একদফা মাপজোখ সেরে নিলাম। তারপর বৃষ্টি কমলে তিনজনেই বেরোলাম রাস্তায়। গোগোই আবার হাফলঙে ফিরে যাবে, তাই গিরিনের দোকানে বসে রইল বাসের অপেক্ষায়। ওর দেশ জোরহাটে। আগামীকাল ও রওনা হবে সেখানে। তাই দিন সাত-দশের ছুটি নিয়েছে ডক্টর সেনগুপ্তের কাছ থেকে।

আমরা শিলচরের পথে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম। ডক্টর সেনগুপ্ত বিভিন্ন প্রাণিবিজ্ঞানীর কথা বলছিলেন। বলছিলেন তাঁর শিক্ষক জে. বি. এস. হলডেন, মিসেস হলডেন ও প্রয়াত জ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ির কথা। আমি

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম এইসব প্রতিভাবান বিজ্ঞানীদের নানান ঘটনা।

কুয়াশার মধ্যে অনেকটা পথ হেঁটে গিয়ে আমরা আবার পয়েন্টের দিকে ফিরলাম। হঠাৎ দেখি একটি খাসিয়া ছেলে একটা লম্বা লাঠি হাতে আমাদেরই দিকে হেঁটে আসছে। একটা পাটকিলে রঙের সাপ তার লাঠির গায়ে পাকে পাকে জড়ানো।

পাহাড়ী জায়গায় সাপ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। গত দিনগুলোয় যখন পাহাড়ে বা জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছি, মুখে না প্রকাশ করলেও মনে মনে সাপের ভয় ছিল। এর আগে আজকের মতো এমন তোড়ে বৃষ্টি নামেনি। ফলে সাপের দল গর্ত ছেড়ে বেরোয়নি। আজ গর্তে জল ঢুকে পড়ায় ওরা বাধ্য হয়ে বেরিয়ে পড়েছে বাইরে। এরকম বৃষ্টি যদি আরও ক'দিন চলে তাহলে যে আরও অনেক সাপের দেখা পাব তাতে সন্দেহ নেই।

ছেলেটি সাপ নিয়ে এগিয়ে আসছিল। ভয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাপটিকে কাছ থেকে দেখার কৌতূহলও ছিল, কিন্তু আমাদের কাছাকাছি এসে পৌঁছনোর আগেই ছেলেটি লাঠিসমেত সাপটিকে ছুড়ে ফেলে দিল ডানদিকের খাদে, জঙ্গলে। ওকে জিজ্ঞেস করে জানলাম সাপটি কী সাপ তা ও জানে না। তবে রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছিল, তাই ও লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলেছে। ব্যাপারটা এতই সাধারণ! সত্যিই তো, যে সাপ চেনে না তার কাছে বিষধর সাপ ও নির্বিষ সাপ দুই-ই সমান!

সন্ধেবেলা ডি. এফ. ও. মিস্টার অধিকারী এলেন জাটিঙ্গায়। আমাদের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল। তাঁর সঙ্গে তিন নম্বর টাওয়ারে গিয়ে বসলাম। তিনি কর্মজীবনের শেষ দু-বছর কাটানোর জন্য নিযুক্ত হয়েছেন হাফলঙে। নতুন এসেছেন, তাই সেমিনার সম্পর্কে তেমন একটা ধারণা নেই, অথচ প্রধান দায়িত্ব তাঁরই ওপরে। ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে সেমিনারের বিষয়ে গঠনমূলক নানান আলোচনা করলেন মিস্টার অধিকারী। তারপর উনি জিপ নিয়ে হাফলঙ রওনা হলেন। যাওয়ার পথে আমাদের নামিয়ে দিলেন এক নম্বর টাওয়ারের কাছে।

টাওয়ারে ফিরে বিশেষ কোনও কাজ না থাকায় আমি পাশের ঘরে গিয়ে রাজমিস্ত্রিভাইদের সঙ্গে তাস খেলায় মেতে গেলাম। আর ডক্টর সেনগুপ্ত চিঠি লেখা, ফিল্ড বুকে নোট নেওয়া, এসব নিয়ে ব্যস্ত রইলেন আমাদের ঘরে।

রাত তখন ক'টা হবে? বড় জোর ন'টা-সোয়া ন'টা। দিব্যি তাস খেলছি, হঠাৎ ডক্টর সেনগুপ্তের চিৎকার শুনলাম, 'পাখি! পাখি!'

হাতের তাস ফেলে ছুটে এলাম বাইরের বারান্দায়। ডক্টর সেনগুপ্ত আগেই সেখানে হাজির। বারান্দা থেকে নীচে নেমে উনি তখন খোঁজাখুঁজি করছেন কী যেন। আমাকে দেখেই বললেন, 'বারান্দার আলোয় এইমাত্র একটা মুরহেন এসেছিল। আমি ঘর থেকে উঠে এসে ধরবার আগেই সেই বেড়ালটা ঝাঁপিয়ে পড়ে ওটাকে মুখে করে নিয়ে পালাল। আমি দৌড়ে বেরিয়ে একটা আধলা ইট ছুড়ে মারলাম, কিন্তু বেড়ালটা অন্ধকারে ঝোপের মধ্যে পালিয়েছে।'

মুরহেন-এর পোশাকী নাম ইন্ডিয়ান মুরহেন (বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Gallimula chloropus indica*)। জল-মুরগি নামে বেশি পরিচিত। চঞ্চুর ওপরে-নীচে টকটকে লাল রং। গায়ের রং কালো, ছাই, আর বাদামী। সবুজ কাঠির মতো পা। আমাদের কপাল খারাপ, তাই এই পাখিটা ধরা গেল না।

হইচই শুনে চাচাদের কয়েকজন উঠে এসেছিলেন বাইরে। আমরা সকলে মিলে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও শিকার অথবা শিকারীর কোনও হদিস পেলাম না। বাঘা বেড়ালটা চালাক কম নয়!

তাস খেলার রেশ কেটে গিয়েছিল। সুতরাং আমরা দুজনে আমাদের ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। ভোল্টেজ একটু কমে আসায় বৈদ্যুতিক বাতিগুলোর তেজ সাময়িকভাবে কমে গিয়েছিল। অল্প আলোয় পড়া-লেখার উপায় নেই। অতএব ঠিক করলাম আমার ভূতলশয্যা বিছিয়ে কাজ এগিয়ে রাখি। সেই কাজ এগোতে গিয়েই কালো কাঁকড়াবিছেটা আমার নজরে পড়ল। বিছানার মাথার কাছে দেওয়ালে চুপটি করে স্থির হয়ে রয়েছে। আলো কম থাকায় চট করে নজরে না পড়ারই কথা। কিন্তু কপাল ভালো যে দেখতে পেয়েছি। এক ঘরে কাঁকড়াবিছের সঙ্গে সহবাসে আমার যথেষ্ট ভয়। এমনিতেই দিনের বেলা যখন-তখন বোলতা ও ভীমরুল ঘরের মধ্যে এসে ওড়াউড়ি করে। ছোট্ট একটা মৌমাছির বাসাও রয়েছে ঘরের ছাদে। এছাড়া রাতে পোকামাকড়ের অত্যাচার তো আছেই! সুতরাং কাজটা নিষ্ঠুর হলেও পাশের ঘরে ছোট চাচার কাছে হাতুড়ি চাইতে গেলাম। চাচা ঘটনা শুনে একটা লোহার হাতুড়ি নিয়ে এসে নিজেই খতম করলেন প্রাণীটাকে।

সে-রাতে গিরিনের দোকানে খাওয়া-দাওয়া সেরে আমরা গেলাম তিন নম্বর টাওয়ারে। আজ আবহাওয়া পাখি পড়ার অনুকূল, সুতরাং আকোস্তা ও পহেলা সার্চলাইট জ্বেলে যথারীতি বসে আছে। আশেপাশের জমিতে হ্যাজাকসমেত অন্যান্য কয়েকজন শিকারীকেও চোখে পড়ল।

টাওয়ারের বারান্দায় বসে দু-একটা পাখিকে কুয়াশার মধ্যে উড়ে যেতে দেখলাম। টাওয়ারের বাঁদিকে, একটু ওপরের জমিতে দুটি খাসিয়া যুবক শিকারের আশায় দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎই একটা উড়ন্ত পাখি লক্ষ করে তারা লাঠি চালাল। বাতাস কাটার সাঁই-সাঁই শব্দ হল। সেই সঙ্গে আহত পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ। কিছু একটা পড়ল পাশের ঘন ঝোপে।

তৎক্ষণাৎ শুরু হয়ে গেল খোঁজাখুঁজির পালা। টর্চের আলো ফেলে ঝোপঝাড় তছনছ করে দু-তিনজন খুঁজতে লাগল পাখিটাকে। পহেলাও তাতে যোগ দিল। ওদের সাপখোপের ভয়ডর বলে কিছু নেই।

একটু পরেই পাখিটাকে পাওয়া গেল। গ্রিন পিজিয়ন বা হরিয়াল ঘুঘু। খুব সুন্দর দেখতে। পায়রার মতো দেখতে হলেও সবুজ, বেগুনি, ছাই— অনেকরকম রং গায়ের পালকে। জঙ্গলের এই বাসিন্দাটি মূলত ফল খেয়ে বেঁচে থাকে। এর পোশাকী নাম নদার্ন গ্রিন ইমপিরিয়াল পিজিয়ন (বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Ducula aenea sylvatica*)।

বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজি করে পাখিটা কোথায় আহত হয়েছে বোঝা গেল। ডানদিকের ডানার নীচে লাঠির ঝাপটা খেয়ে মাংস ফেটে রক্ত পড়ছে। আহত সুন্দরকে দেখলে কত কষ্ট হয় সেই মুহূর্তে বুঝলাম। শিকারীরা পাখিটা নিয়ে চলে গেল।

এই হরিয়াল ঘুঘু বা গ্রিন পিজিয়ন নিয়ে খাসিয়াদের একটি চমৎকার উপকথা প্রচলিত আছে। ওদের ভাষায় গ্রিন পিজিয়নকে বলে 'লাঙওয়ারকু'। এই পাখি সবসময় গাছেই থাকে, বলতে গেলে কখনওই মাটিতে নামে না। তাই এইটুকু সূত্রের ওপরে নির্ভর করেই তৈরি হয়েছে খাসি উপকথা ঃ 'কা লাঙওয়ারকু সাঙ খাইনদিউ'। গল্পটি এইরকম ঃ

দুটি বোন ছিল। তাদের বাবা ছিল না। মা-ই তাদের দেখাশোনা করত। মায়ের সঙ্গে তারা দিব্যি সুখে থাকত। শিশু বয়েসে বাবার অভাব তারা তেমন করে বুঝতে পারত না। অথচ সে-জন্য মায়ের মন সবসময়েই কেমন করত। সে একার উপার্জনে মেয়েদের খাওয়া-পরা ঠিকমতো চালাতে পারত না। তার বয়েস ছিল অল্প, ফলে মাঝে মাঝে ভীষণ একা একা লাগত। একসময়ে সে ঠিক করল আবার বিয়ে করবে। কিন্তু বিয়ের পর সৎ-বাবা যখন বাড়িতে এল, তখন থেকেই শুরু হল দু-বোনের সর্বনাশের দিন। সৎ-বাবা ওদের খেতে দিত না, সবসময় মারধর করত। দেখতে দেখতে মেয়ে দুটোর চেহারা হয়ে গেল কঙ্কালসার। একসময় মেয়েরা ভাবল, অনেক সহ্য করা গেছে, আর নয়। একদিন মা-বাবা যখন খেতে চাষ করতে গেছে,

ওরা দুটিতে পোষা মুরগির পালক জোগাড় করে নিজেদের গায়ে লাগিয়ে নিল উড়ে পালানোর জন্য। পালক লাগাতেই ওরা হয়ে গেল একজোড়া হরিয়াল ঘুঘু। সঙ্গে সঙ্গে ওরা উড়ে চলে গেল কাছাকাছি একটা গাছে। তারপর থেকেই দু-বোন সবসময় গাছেই থাকে। কোনও সময় মাটিতে নামে না। ওরা ঠিক করল মা ফিরে এলে তাকে বলবে যে, এখন থেকে বনজঙ্গলই ওদের ঘরবাড়ি। মা ফিরে এসে ওদের অনেক করে বলল ঘরে ফেরার জন্য। অনেক কান্নাকাটি করল, অনেক চোখের জল ফেলল, কিন্তু ওরা শুনল না। ওরা উড়ে চলে গেল। আর কোনওদিনও ফিরে এল না।

গ্রিন পিজিয়নের 'ওয়ারকু! ওয়ারকু!' ডাক খাসিয়াদের সবসময় এই দুঃখের কাহিনীটি মনে পড়িয়ে দেয়।

আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে একসময় আমরা চলে এলাম তিন নম্বর টাওয়ার থেকে। আসার আগে আকোস্তাকে ছোট মাপের পাখির প্রয়োজনটা আর-একবার মনে করিয়ে দিলাম।

টাওয়ারে এসে শুয়ে পড়লাম। ঘন ঘন বৃষ্টি হওয়ায় আজ আরও বেশি শীত করছিল। কয়েকটা পুরনো খবরের কাগজ পেতে দিলাম তোয়ালের নীচে। তাতেও ঠাণ্ডা ঠেকাতে না পেরে বিছানা ছেড়ে উঠে গেলাম পাশের ঘরে। চাচারা সবাই পুরনো কার্পেটের ওপরে অঘোরে ঘুমিয়ে। একপাশে বড় টেবিলটার ওপরে আমাদের যন্ত্রপাতি-সাজসরঞ্জাম সব রাখা ছিল। প্যাকিংয়ের জন্য যে-তুলো ব্যবহার করেছিলাম সেগুলো ফেলে দিইনি। কারণ কখন কোন কাজে লাগবে কে বলতে পারে! যেমন এখন। অনেকখানি তুলো সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলাম নিজেদের ঘরে। বারান্দার আলোয় অসংখ্য পোকামাকড় ফড়ফড় করে উড়ছে। ঘরে ঢুকেই চট করে দরজা বন্ধ করে দিলাম, যাতে ওগুলো ঘরে ঢুকে না পড়ে। ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে শুনেছি, অনেক পোকামাকড়ই মানুষকে যুতসই কামড় দিতে পারে।

তুলোগুলো শীতের পোশাকের নীচে বুকে-পিঠে গুঁজে শুয়ে পড়লাম। শীত একটু কমল বটে তবে পুরোপুরি গেল না। তা সত্ত্বেও ঘুম এসে গেল একটু পরেই।

রাত তিনটে নাগাদ আকোস্তা ও পহেলার ডাকে ঘুম ভাঙল আমাদের। উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। আকোস্তা একটা পাখি ধরেছে তিন নম্বরে,

সেটা আমাদের দিতে এসেছে। ছোট মাপের এত রঙচঙে পাখি আমি এর আগে ছবিতেও দেখিনি। মাথায় ও ঘাড়ে উজ্জ্বল লালচে বাদামী রং। দু-গাল ও গলার রং কালো। পিঠ নীলচে সবুজ। কাঁধের কাছে ও পুঁচকে লেজের ওপরটা উজ্জ্বল নীল। লেজের ঠিক নীচে টুকটুকে লাল রং। পেটের রং কালো। বুকের রং সবুজাভ-নীল। ডানার পালকগুলো কালো। তবে ডানা ছড়ানো থাকলে দু-ডানার মাঝেই ধবধবে সাদা দুটি বৃত্তাকার ছোপ চোখে পড়ে—অনেকটা শালিকের ডানার সাদা ছোপের মতো।

আকোস্তার হাত ফসকে পাখিটা ঘরের মধ্যে কয়েকবার ওড়াউড়ি করছিলে। তখনই ডানার সাদা বৃত্ত দুটো আমার চোখে পড়েছে।

পাখিটার নাম হুডেড পিট্টা বা গ্রিনব্রেস্টেড পিট্টা (বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Pitta sordida cucullata*)। হিমালয় অঞ্চলের তরাই ও ডুয়ার্সে পাহাড়ের পাদদেশ থেকে ২০০০ মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এদের দেখা মেলে। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, নেপাল, ভুটান, আসাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ইত্যাদি অঞ্চলে শালিকের মাপের এই ছোট পাখিটি অপরিচিত নয়। সাধারণত গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা, একা একা থাকে, মাটিতে লাফিয়ে লাফিয়ে পোকামাকড় খুঁটে খায়। সুন্দর সুরেলা শিস দিতে পারে এই পাখি। যদিও আমাদের সেই ডাক শোনার সৌভাগ্য হয়নি।

পাখিটা আমরা বুককেসের নীচের অংশে কাচের স্লাইডিং দরজাওয়ালা প্রকোষ্ঠে রেখে দিলাম। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সুন্দর পাখিটাকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারিনি।

পরদিন রবিবার। সেদিন বেলা দুটোয় মিস্টার অধিকারীর এক নম্বর টাওয়ারে আসার কথা। ডক্টর সেনগুপ্তকে সঙ্গে নিয়ে জাটিঙ্গা গ্রাম পরিদর্শনে বেরোবেন তিনি। পরিচিত হবেন গ্রামের বিশিষ্ট মানুষজনের সঙ্গে। মিস্টার অধিকারী এই জেলায় নতুন এসেছেন, আগেই বলেছি। আর ডক্টর সেনগুপ্ত গত সাত-আট বছর ধরেই জাটিঙ্গায় যাতায়াত ও অস্থায়ী বসবাস করছেন। সুতরাং ডক্টর সেনগুপ্তকে সঙ্গী হওয়ার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। তাছাড়া ডক্টর সেনগুপ্ত নিজের কয়েকটা দরকারি কাজে হাফলঙ যাবেন। গ্রাম পরিদর্শনের পর মিস্টার অধিকারী তাঁকে হাফলঙ পর্যন্ত লিফ্‌ট্ দেবেন।

তিনটে নাগাদ মিস্টার অধিকারী ও আকোস্তা এল আমাদের ঘরে। আমাদের যন্ত্রপাতিগুলো সব মিস্টার অধিকারীকে দেখানো হল—তাদের কার্যপদ্ধতিও সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিলাম আমি। তারপর ডক্টর সেনগুপ্ত ওঁদের

সঙ্গে চলে গেলেন। যাওয়ার সময়ে পিট্রা পাখিটাকে নিয়ে গেলেন। গেস্ট-হাউসের পাখির খাঁচায় ছেড়ে দেবেন। তাহলে যদি বেঁচে থাকে। কারণ পাখিটা সারা সকাল ঝিম মেরে বসেছিল। সেই সময়ে ওর ওপরে দণ্ড চুম্বকের প্রভাব নিয়ে পরীক্ষা চালিয়েছি। পরে দু-চারটে পোকামাকড় ধরে খেতে দিয়েছিলাম, কিন্তু পাখিটা মুখে তোলেনি।

সুতরাং বিকেল থেকে টাওয়ারে আমি একা। ডক্টর সেনগুপ্ত মঙ্গলবার সকালে ফিরবেন এরকম বলে গেছেন। একা একা মাপজোখের কাজটা অসুবিধেজনক হলেও তাঁকে বলেছি কাছাকাছি জায়গাগুলোয় আর একদফা করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার কাজ সেরে নেব—যেমন চার্চ কম্পাউন্ডে বা পয়েন্টে। আজ কেমন যেন আলস্য লাগছিল। তাই বিকেলবেলা এমনিই ঘুরতে বেরোলাম রাস্তায়।

টাওয়ার থেকে নেমে হেঁটে এগোচ্ছি পয়েন্টের দিকে, দেখি গোধূলির আলোয় অনেকগুলো বাদুড় উড়ে বেড়াচ্ছে মাথার ওপরে। এ রকম দৃশ্য আগে কখনও চোখে পড়েনি। বাদুড়গুলো খুব ধীরে ধীরে ভেসে বেড়াচ্ছিল বাতাসে, হঠাৎই কোথা থেকে ছুটে এল তিনটে খাসিয়া ছেলে। ওদের হাতে মূলী বাঁশের লাঠি। ব্যস! শুরু হয়ে গেল সাঁই-সাঁই লাঠি চালানো। একটা বাদুড় খসে পড়ল পাহাড়ের ঢালে। ছেলেরা ছুটল সেটা ঝোপঝাড়ের ভেতর থেকে উদ্ধার করে আনতে। ততক্ষণে পশ্চিমের আকাশে আলোর শেষ রেশটুকুও মুছে গেছে।

আবহাওয়ায় গতকালের মতোই ঘন কুয়াশার আবরণ, আর থেকে থেকেই ঝিরঝিরে বৃষ্টি। হাঁটতে হাঁটতে পয়েন্টের দিকে গিয়ে দেখি গিরিনের দোকান বন্ধ। প্রতি রবিবারেই ও দোকান বন্ধ রাখে, তবে রাস্তা পেরিয়ে ঘরে গিয়ে ডাকাডাকি করলে চা-বিস্কুটের ব্যবস্থা করে দেয়। আজ সেরকম ইচ্ছে করল না। কারণ দেখলাম, পয়েন্টে, তিন নম্বর টাওয়ারের উলটোদিকে, একটি দোকান খোলা রয়েছে। খোলা মানে, সদর দরজা আংশিক খোলা আর কি। কলকাতায় 'স্থানীয় বন্‌ধ্'-এর চাপে পুরোপুরি নতিস্বীকার না করে কোনও কোনও দোকানদার যে-ধরনের ঝুঁকি নিয়ে থাকেন, ঠিক সেইরকম। দোকানটা এতদিন বন্ধ দেখেছি। গিরিনের মুখে শুনেছিলাম, মালিক দেশে গেছে।

চায়ের তেষ্টা মেটাতে সেই দোকানে ঢুকে নতুন অভিজ্ঞতা হল। দোকানদারের মুখে দোকান বন্ধ রাখার কারণ শুনলাম ঃ স্থানীয় বাসিন্দাদের অনেকেই তাঁর দোকানে খেয়ে পয়সা দেয় না। বলে যায়, 'পরে দেব।'

অথচ পরে আর আদায় হয় না। ধার দেওয়া যে একেবারে বন্ধ করে দেবেন, সেরকম সাহসও দোকানী ভদ্রলোকের নেই। উনি পরদেশী—শিলচরের মানুষ। ভিনদেশে ব্যবসা করতে এসে ভিটেমাটি চাটি হওয়ার জোগাড়। ইতিমধ্যেই ধারের পরিমাণ সাত হাজার টাকা ছাড়িয়ে গেছে। সেইজন্যই দীর্ঘ চব্বিশ দিন দোকান বন্ধ রেখে দেশে চলে গিয়েছিলেন। এখানকার লোকজনকে ধরাধরি করে বা হেডম্যানকে বলেও পরিস্থিতির কোনও উন্নতি হয়নি। এখন ধীরে ধীরে সর্বস্বান্ত হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছেন।

শুনে দুঃখ হল। কলকাতা থেকে জাটিঙ্গা কত দূরে, অথচ কোনও কোনও বিষয়ে কলকাতার সঙ্গে কত মিল! তখন বৃষ্টি পড়ছিল। ফলে দোকানে কিছুক্ষণ আটকে গিয়েছিলাম। সেই সুযোগে জনৈক মত্ত খাসিয়া যুবকের মস্তানী আচরণ দেখার সুযোগ হল। দোকানদারকে যা-নয় তাই বলে শাসিয়ে সে চা-বিস্কুট খেল। বারবার বলল, দোকানদার যে তাদের দেশে ব্যবসা করতে এসেছে সে-কথা যেন কোনও সময়ে ভুলে না যায়। ঘটনাস্থলে আমিও ভিনদেশী, তাই চুপ করে দর্শক হয়েই রইলাম। বারবার আকোস্তা, পহেলা ওদের কথা মনে পড়ছিল। সব দেশেই যে পয়সার দুটো পিঠ থাকে জাটিঙ্গায় আরও একবার তার প্রমাণ পেলাম।

রাতে খাওয়া-দাওয়ার পর আকোস্তা-পহেলার সঙ্গে তিন নম্বর টাওয়ারের বারান্দায় গিয়ে বসলাম। পাঁচশো ওয়াটের সার্চলাইট জ্বলছে। আবহাওয়াও মন্দ নয়। যদি পাখি আসে। কিন্তু কপাল মন্দ। রাত সাড়ে তিনটে পর্যন্ত বসে থেকেও কোনও পাখি পেলাম না, যদিও অনেক পাখিকেই কুয়াশায় ওড়াউড়ি করতে দেখলাম। যেমন রাত দুটো নাগাদ একটা পাখি তীরবেগে উড়ে এসেছিল আমাদের বারান্দা লক্ষ করে, কিন্তু বারান্দার চালে লেগে পলকে ঠিকরে গেছে অন্ধকারে। অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার কোনও হদিস পাওয়া যায়নি, আর চিনতেও পারিনি সেটা কী পাখি।

সাত

সোমবার রাতে রাস্তায় পায়চারি করছি, একটা চলন্ত জিপ থেকে কেউ আমার নাম ধরে ডাকল। তারপরই জিপটা থামল। কাছে গিয়ে দেখি মিস্টার অধিকারী ও ডক্টর সেনগুপ্ত।

জিপে উঠে পড়লাম। ওঁদের সঙ্গে গেলাম তিন নম্বর টাওয়ারে। সেখানে

বনবিভাগের আরও কয়েকজন এলেন। আলোচনা হল আসন্ন সেমিনার নিয়ে। সেমিনার হবে জাটিঙ্গা হাসপাতালের মাঠে।

দু-নম্বর টাওয়ারের সাইনবোর্ড ও পয়েন্টের মাঝামাঝি জায়গায় পিচের রাস্তা থেকে খানিকটা উঁচুতে জাটিঙ্গা হাসপাতাল। সেখানে দাতব্য চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। হাসপাতাল-বাড়ির সামনেই বেশ বড়সড় সবুজ সমতল মাঠ। ম্যারাপ বেঁধে সেমিনার হয় সেখানেই। মণ্ডপসজ্জা, আলোকসজ্জা, নেমন্তন্ন, যাতায়াতের গাড়ি, হাফলঙের গেস্ট-হাউসে অতিথিদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—সব নিয়েই অল্পবিস্তর আলোচনা করলেন মিস্টার অধিকারী। বয়েস হলেও মানুষটির পরিশ্রম-উৎসাহ-উদ্দীপনায় কোনও ঘাটতি নেই। ১৯৮৫-র সেমিনার যে সফল হয়েছে তা প্রধানত মিস্টার অধিকারীর আন্তরিক চেষ্টাতেই।

রাত সাড়ে দশটা নাগাদ ওঁরা জিপে চড়ে আবার রওনা হয়ে গেলেন হাফলঙে। আর আমিও খাওয়া-দাওয়া সেরে এক নম্বর টাওয়ারে রাত কাটাতে ফিরে গেলাম।

মঙ্গলবার সকালে একা একা কয়েক জায়গায় চৌম্বকক্ষেত্র মাপজোখের কাজ সারলাম। আর সন্ধেবেলা আকোস্তার সঙ্গে গ্রামের দুটো ঘরে অতিথি হয়ে গেলাম। প্রথম বাড়িটি আকোস্তার স্ত্রীর দিদিমার। শয্যাশায়ী বৃদ্ধা মহিলা। বলতে গেলে একাই থাকেন। মহিলাশাসিত সমাজের শাসকগোষ্ঠীর একজন। পরিবারের সকলে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে এখন এই বৃদ্ধা একা। একজন অল্পবয়েসী আত্মীয় মাঝে মাঝে দেখাশোনা করতে আসে। এছাড়া অন্যরাও সময়-সুযোগ পেলে চলে আসে—যেমন আকোস্তা এখন এসেছে।

ড্রইংরুমে আমাকে বসিয়ে চা-বিস্কুট ও তাম্বুল দিয়ে আপ্যায়ন করল আত্মীয়া মেয়েটি। পাশের অন্ধকার ঘরে বৃদ্ধা শুয়ে ছিলেন। আকোস্তা তাঁর পায়ের কাছটায় বসে নিজেদের ভাষায় কথা বলছিল, খবরাখবর নিচ্ছিল। বোধহয় আমার কথাও কিছু বলে থাকবে, কারণ বৃদ্ধা স্বর তুলে কাঁপা গলায় প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন, 'কাঁহা বৈঠা?'—অর্থাৎ, কোথায় উঠেছ? পরে জেনেছিলাম, এ ধরনের হিন্দিকে ওখানে হাফলঙ-হিন্দি বলে।

আমি উঠে তাঁর ঘরের দরজার কাছে গিয়ে বললাম যে, এক নম্বর টাওয়ারে উঠেছি। আবছাভাবে দেখলাম, অশীতিপর শীর্ণ পলকা শরীরে কাঁথা চাপা দিয়ে বৃদ্ধা শুয়ে আছেন। এককালের প্রতাপশালী শাসক, আজ অসহায়, অথর্ব! দেখলে কষ্ট হয়।

একটু পরে সেখান থেকে বেরিয়ে গেলাম আকোস্তার এক 'আঙ্কলের'

বাড়ি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। খুব জমাটি হাসিখুশি মানুষ। শুধু কলকাতার গল্পেই কোথা দিয়ে যেন ঘণ্টাখানেক সময় কেটে গেল। তারপর ফিরে এলাম টাওয়ারে।

মনে আছে, সেদিন রাতে মুষলধারে বৃষ্টি এসেছিল।

বুধবার সকালে কুয়াশা ও ঝিরঝিরে বৃষ্টির মধ্যে শিলচরের বাস ধরে ডক্টর সেনগুপ্ত জাটিঙ্গায় ফিরে এলেন। কুয়াশা-বৃষ্টি থাকলে কী হবে, আমরা ক্রমশ হতাশ হয়ে পড়ছি। কারণ সেই চোদ্দ তারিখে অমাবস্যা গেছে, আর আজ পঁচিশ তারিখ—আটাশ তারিখে পূর্ণিমা। সুতরাং এই শুক্লপক্ষে, পূর্ণিমার কাছাকাছি সময়ে, পাখি পড়ার সম্ভাবনা একরকম নেই বললেই চলে। কিন্তু রহস্যময় পাখিদের অভিসন্ধিই বোধহয় ছিল অন্যরকম—কারণ পঁচিশ তারিখ গভীর রাতে তারা ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এল আলোর আকর্ষণে। সেই ঘটনাকে মোটামুটি ফেনোমেনন বলা যায়।

দিনের বেলা কম্পাস নিয়ে মাপজোখ নিতে আমরা গিয়েছিলাম জাটিঙ্গা রেল স্টেশনে। সেখান থেকে পয়েন্টে ফিরে দেখি গিরিনের দোকান বন্ধ। খোঁজ নিয়ে জানলাম, জমির মালিকের সঙ্গে অন্য কারও কী এক জটিলতা দেখা দেওয়ায় হেডম্যান গিরিনকে দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। জাটিঙ্গার জমির মালিক হয় ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল, নয় বনদপ্তর, না হয় তো গ্রামবাসী খাসিয়ারা। স্থানীয় অধিবাসী ছাড়া বাইরের কাউকে বিনা অনুমতিতে এখানে জমি হস্তান্তর করা নিষিদ্ধ। তাই এখানে ভিনদেশী সকলেই জায়গা-জমি ভাড়া নিয়ে দোকান করেছে।

সারাদিন ধরে থেকে-থেকেই বৃষ্টি চলল। রাতে কুয়াশা থাকলেও ঝাপসাভাবে চাঁদ দেখা যাচ্ছিল। সুতরাং বৃষ্টির মধ্যে হতাশ মনেই আমরা টাওয়ারে ফিরে এলাম। আকোস্তার সঙ্গে পয়েন্টে দেখা হয়েছিল। ও যথারীতি আলো জ্বেলে অপেক্ষা করবে তিন নম্বর টাওয়ারে।

ঘরে এসে ডক্টর সেনগুপ্তের সঙ্গে কাজের ব্যাপারে কথা হচ্ছিল। এখন আমাদের মাপজোখ বাকি কেবলমাত্র দূরের তিনটি জায়গায়—হারাঙ্গাজাও উপত্যকা, মাহুর ও লোয়ার হাফলঙ স্টেশন। কলকাতা থেকে জিপ এখনও এসে পৌঁছয়নি। কবে আসবে ঈশ্বর জানেন! ঠিক করলাম, আর দু-একদিন দেখে তারপর আমরা বিকল্প ব্যবস্থা নেওয়ার চেষ্টা করব।

রাত বারোটা নাগাদ দুজনে শুয়ে পড়লাম। ঘুমও এসে গেল খুব

তাড়াতাড়ি। কিন্তু রাত দুটো নাগাদ পহেলার গলা পেলাম—চাচাদের ঘরের দরজা খুলে ও কথা বলছে কার সঙ্গে। উঠে গিয়ে দরজা খুললাম।

আমাকে দেখেই পহেলা বলল ও পেট্রল নিতে এসেছে। কারণ তিন নম্বর টাওয়ারের জেনারেটারের তেল ফুরিয়ে এসেছে। চাচাদের ঘরে তেলের টিন রাখা ছিল, ও সেটা নিয়ে চলে গেল।

তখনও কুয়াশা রয়েছে, ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ছে। বারান্দা থেকে উঁকি মেরে দেখি চাঁদও নজরে পড়ছে ঝাপসাভাবে।

ঘরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ আকোস্তা ডাকাডাকি করতে দরজা খুললাম। দেখি আকোস্তা, পহেলা ও তৃতীয় একটি যুবক—ওদের হাতে পাখি। মোট পাঁচটা পাখি নিয়ে এসেছে আকোস্তা। রাত আড়াইটে-তিনটে নাগাদ তিন নম্বর টাওয়ারে এই পাখিগুলো এসে পড়েছে। আরও একটা হুডেড পিট্টা ধরা পড়েছিল, কিন্তু সেটা মরে গেছে। চাঁদ ঢলে পড়ার মুখে কুয়াশা আরও গাঢ় হয়েছিল, বাতাস ছিল, বৃষ্টিও ছিল বেশ জোরে—সেই সময়েই মিনিট দশ-পনেরোর জন্য ফেনোমেনন হয়েছে।

পাখিগুলো যথাক্রমে থ্রি-টোড কিংফিশার, রাডি কিংফিশার, ব্ল্যাক বিটার্ন, ইয়েলো বিটার্ন ও হোয়াইটব্রেস্টেড ওয়াটারহেন। পাখিগুলো পোর্টম্যান্টোর ওপরে রেখে ছবি তুললাম। তারপর ওদের রেখে দিলাম বুককেসের নীচের চেম্বারে। আকোস্তাদের কফি করে খাওয়ালাম, আমরাও খেলাম।

ওরা যখন বিদায় নিল তখন ছাব্বিশ তারিখের সকাল অনেকটা এগিয়ে গেছে।

শুক্লপক্ষের এরকম একটা সময়ে ফেনোমেনন ঘটে যাওয়ায় ডক্টর সেনগুপ্ত বেশ অবাক হয়েছিলেন। তাঁর কাছে এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। বারবার সে-কথাই বলছিলেন তিনি। একটু পরে আমরা দুজনে বেরোলাম গ্রামে ঘুরতে। উদ্দেশ্য ঃ কাল রাতে কোথায় কীরকম পাখি পড়েছে তার খোঁজখবর নেব।

খোঁজ করে জানলাম, কাল রাতে গ্রামে তেমন পাখি আসেনি। যা এসেছে তিন নম্বর টাওয়ার, কবরখানা, এইসব অপেক্ষাকৃত নিচু জায়গায়। বিভিন্ন মানুষজনের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ করে যেটুকু আন্দাজ পেলাম তাতে মনে হয় গতকাল রাতে অন্তত শ-পাঁচেক পাখি পড়েছে গোটা জাটিঙ্গায়। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, 'বছরের পর বছর পাখির সংখ্যা ক্রমশই কমে আসছে। পাঁচ-সাত বছর আগে হলে অন্তত হাজার দু-তিন পাখি পড়ত কাল রাতে।'

গ্রাম থেকে মূর্তির পাশ দিয়ে পিচের রাস্তায় নেমে এলাম। কয়েকজন ছেলেমেয়ে স্কুলে যাচ্ছিল। দেখি একটি মেয়ের হাতে একটা থ্রি-টোড কিংফিশার। যেন একটা খেলনা—স্কুলে বন্ধুদের দেখাতে নিয়ে চলেছে।

পয়েন্টে এসে দেখি গিরিনের দোকান খুলেছে। তার পাশেই জনৈক খাসিয়া যুবকের ঘর ছিল। আমরা বাইরে বসে চা-বিস্কুট খাচ্ছি, তখন নজরে পড়ল পাশের ঘরের দরজায় একটি বাচ্চা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে—তার দু-হাতে দুটি তিন-আঙুলে মাছরাঙা। তাদের পায়ে সুতো বাঁধা। আলোর ফাঁদে এই প্রজাতির পাখিটাই বেশি করে ধরা পড়েছে মনে হল।

টাওয়ারে ফিরে বন্দি পাখিগুলোকে পোকামাকড় ও জল খেতে দিলাম, কিন্তু ওরা সেদিকে নজরও দিল না। সবক'টা পাখিই কেমন আচ্ছন্নের মতো চুপটি করে বসে আছে। শুধু হোয়াইটব্রেস্টেড ওয়াটারহেন বা ডাহুক পাখিটা বুক কেসের তাকে বেশ চঞ্চলভাবে পায়চারি করছে আর কুঁক-কুঁক শব্দ করে ডাকছে। পাখিটার পোশাকী নাম ইন্ডিয়ান হোয়াইটব্রেস্টেড ওয়াটারহেন (বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Amaurornis phoenicurus phoenicurus*)। জলা, পুকুর, ডোবা, ভেসে যাওয়া ধানক্ষেত, ডুয়ার্স ও পাহাড়ি পাদদেশে দেড় হাজার মিটার উচ্চতা পর্যন্ত এর দেখা মেলে। পোকামাকড় আর জলজ উদ্ভিদের শেকড়-বাকড় খায়। চেহারা অনেকটা মুরগির মতো, তবে ঝুঁটি নেই। কাঠি-কাঠি সবুজ পা। স্লেট রঙের শরীর—চোখের চারপাশ, বুক, পেট ধবধবে সাদা, আর ভোঁতা লেজের নীচটা লালচে বাদামী। স্ত্রী ও পুরুষ পাখি একইরকম দেখতে।

এবারে বাকি তিনটে পাখির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাক।

রাডি কিংফিশার বা লাল মাছরাঙা (বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Halcyon coromanda coromanda*) মাপে শালিকের মতো। মরচে লাল আর ম্যাজেন্টা রঙের মাঝামাঝি গায়ের রং। লেজের নীচটা সাদা—উড়ন্ত অবস্থায় দেখা যায়। চঞ্চুর রঙও উজ্জ্বল লাল। নেপাল, সিকিম, ভুটান, অসমে ব্রহ্মপুত্র নদীর দু-পাশে, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, পশ্চিমবঙ্গ ইত্যাদি জায়গায় দেখা যায়। জঙ্গলে লুকিয়ে থাকতে ভালোবাসে। যত না দেখা যায়, তার চেয়ে ডাক শোনা যায় বেশি। প্রধান খাদ্য মাছ, কাঁকড়া, ফড়িং, পোকামাকড় ইত্যাদি।

দ্বিতীয় পাখি ব্ল্যাক বিটার্ন বা কালো বক (বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Ixobrychus flavicollis flavicollis*) মাপে সাধারণ কোঁচ বকের মতো।

কালো, ছাই আর গাঢ় নস্যি রঙের ছিটে দেওয়া গায়ের রং। লম্বায় প্রায় আটান্ন সেন্টিমিটার। আসাম, মণিপুর আর পশ্চিমবঙ্গের গাঙ্গেয় অঞ্চলে দেখা যায়। এছাড়া বেশি বৃষ্টিপাতের জায়গাতেও দেখা মেলে—যেমন কেরল ও মহিশূরে। অনেক সময় পরিযানে অংশ নেয়। ১৯৬৫ সালে মালয়ে চিহ্নিত একটি পাখিকে এক বছর পরে মণিপুরে পাওয়া গেছে। প্রধান খাদ্য মাছ, ব্যাঙ ও জলচর পোকামাকড়।

ইয়েলো বিটার্ন বা কাঠ বক (বৈজ্ঞানিক নাম ঃ *Ixobrychus sinensis*) আকারে ব্ল্যাক বিটার্নের চেয়ে ছোট। এর মাপ আটত্রিশ সেন্টিমিটার। এছাড়া বাকি স্বভাব-চরিত্রে ব্ল্যাক বিটার্নের সঙ্গে অনেকটাই মিল পাওয়া যায়। গায়ের রং প্রধানত বাদামী ও হলদেটে বাদামী, মাঝে মাঝে কালোর ছোপ। এরও মূল খাদ্য মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি।

যখন আমরা দেখলাম পাখিগুলো কিছুই মুখে তুলছে না, তখন ডক্টর সেনগুপ্ত ওদের জোর করে খাওয়ানোর ব্যবস্থা করলেন। গুঁড়ো দুধ আর চিনি জলে গুলে ড্রপারে করে সেই দ্রবণ খাওয়ানো হল পাখিগুলোকে। ডক্টর সেনগুপ্ত পাখিগুলোকে একে একে নিয়ে ওদের ঠোঁট ফাঁক করে ধরলেন আর আমি ড্রপার মুখের ভিতরে ঢুকিয়ে অল্প অল্প করে দুধ-চিনির দ্রবণ ঢেলে দিতে লাগলাম ওদের গলায়। ডক্টর সেনগুপ্ত বারেবারেই পাখিগুলোকে ঠোঁট চেপে ধরে ঝাঁকিয়ে দিতে লাগলেন, যাতে দ্রবণটা ওদের পেটে চলে যায়—তাহলে ওরা সেটা আর উগরে দিতে পারবে না। কিন্তু দেখা গেল, ঠোঁট ছেড়ে দেওয়ামাত্রই ব্ল্যাক বির্টান ও থ্রি-টোড কিংফিশার দ্রবণটা উগরে দিতে লাগল বারবার।

বিকেলবেলা খাওয়ানোর জন্য যখন পাখিগুলোকে বের করা হচ্ছে তখন আমাদের সামান্য অসতর্কতার সুযোগে রাডি কিংফিশারটি উড়ে পালাল। ঘরের দরজা-জানলা সব খোলা ছিল, ফলে উড়ে ঘরের বাইরে বেরোতেই পাখিটা প্রকৃতির দেখা পেয়ে গেল। জঙ্গল-গাছপালা উড়ন্ত পাখিটাকে পলকে লুকিয়ে ফেলল তাদের বুকে। মনটা স্বাভাবিকভাবেই একটু খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু সে ক্ষণিকের জন্য।

সন্ধেবেলা বেশ জোরে বৃষ্টি নামল আবার। ঘরের চালে শব্দের খই ফুটতে লাগল। মনে হচ্ছে, অকালবর্ষা নেমে এসেছে জাটিঙ্গাতে। যদি কাল সকালে আবহাওয়া ভালো থাকে তাহলে একবার হাফলঙে যাওয়ার চেষ্টা করব। গেস্ট-হাউসে রাখা ব্যক্তিগত কিছু জিনিসপত্র নিয়ে আসা দরকার, আর পেলে একটা খবরের কাগজ জোগাড় করার চেষ্টা করব।

আট

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙল বৃষ্টির শব্দে।

সাড়ে ন'টা নাগাদ বৃষ্টি থামলে বেরোনোর উদ্যোগ করছি তখনই নীচের রাস্তায় একটা সাদা জিপ চোখে পড়ল। ডক্টর সেনগুপ্ত দেখেই চিনতে পারলেন। কলকাতা থেকে তাঁর সহকারীরা জিপ নিয়ে এসে হাজির। অতএব তিনি বললেন, 'তৈরি হয়ে নিন। আমরা এখুনি রওনা হব হারাঙ্গাজাও।'

মিনিট পনেরোর মধ্যেই যন্ত্রপাতি গুছিয়ে নিয়ে আমরা জিপে উঠলাম। রওনা হলাম ছত্রিশ কিলোমিটার দূরের হারাঙ্গাজাও উপত্যকার দিকে।

আঁকাবাঁকা পথের কয়েক জায়গায় পাহাড়ী ঝরনা চোখে পড়ল। গত কয়েকদিনের দুরন্ত বর্ষায় শীর্ণ জলধারা স্বাস্থ্যবতী হয়েছে। এছাড়া দুর্যোগের ফল হিসেবে আরও চোখে পড়ল ধস। ওপরের পাহাড় থেকে গাছপালাসমেত ভূমিখণ্ড বহু জায়গায় ধসে পড়েছে রাস্তার ওপরে। আঠালো লালমাটি, কাদা, পাথর সব মিলেমিশে স্তূপাকার হয়ে রয়েছে। রাস্তার পাশ থেকে মাটির অংশও আলগা হয়ে ধসে গেছে দু-এক জায়গায়। রাস্তা-সারাইয়ের তৎপর কর্মীরা ইতিমধ্যেই রাস্তা সাফ করা ও মেরামত করার কাজে লেগে পড়েছে।

সহকারীদের নাম সুব্রত, তারক ও অনুপ। ওদের কাছে জানা গেল, কলকাতা-অফিস থেকে ব্যবস্থাপত্রের দেরি হওয়ায় ওরা দেরি করে রওনা হতে বাধ্য হয়েছে। পঁচিশ তারিখ বিকেলে ওরা জিপ নিয়ে এসে পৌঁছেছে হাফলঙের গেস্ট-হাউসে। সেখানে ডক্টর সেনগুপ্তকে না পেয়ে দেড় দিন অপেক্ষা করেছে। তারপর আজ ভোরে অনুমানে ভর করে চলে এসেছে জাটিঙ্গায়। পয়েন্টে খোঁজ নিয়ে জেনেছে, আমরা এক নম্বর টাওয়ারে আছি।

অনুপের কাছে শুনলাম, পিট্টা পাখিটা দিব্যি বেঁচে আছে। তাছাড়া মিস্ট নেটে কয়েকটা চড়ুই পাখি ও দোয়েল ধরা পড়েছিল, সেগুলো ও খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে রাস্তা খুব খারাপ। পাথুরে, এবড়োখেবড়ো। জিপ রীতিমতো ঝাঁকুনি দিয়ে চলছিল। বেশিরভাগ সময়েই পথের পাশে জঙ্গল ও খাদ চোখে পড়েছে। কখনও কোথাও ছোটখাটো বসতি দেখেছি।

বৃষ্টি থেকে-থেকেই হচ্ছিল ঝিরঝির করে। আকাশে মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছিল। তবে হারাঙ্গাজাও পৌঁছতে পৌঁছতে সূর্যের দেখা পেয়েছি।

আর পথ চলতে চলতে দেখা পেয়েছি বুলবুল, ঘুঘু, দোয়েল ও খঞ্জন পাখির।

হারাঙ্গাজাও উপত্যকা খুব সুন্দর জায়গা। সমতল জমিতে বিস্তৃত ধানখেত। তার সীমানায় ঝাঁকড়া গাছপালা। খেত-জমির মাঝখান দিয়ে আলের মতো মোটরপথ চলে গেছে। পথ বেশ অসমতল। কোথাও বেশ ঢালু, কোথাও বা হঠাৎ খানিকটা চড়াই। তবে আমাদের জিপচালক শ্রীঘোষ সুকৌশলে সবরকম বাধাকেই শায়েস্তা করেছেন।

আমাদের লক্ষ ছিল জাটিঙ্গা নদীর পাড়ের সমতলভূমি। কিন্তু সেখানে পৌঁছনোর আগেই একটা দুর্ঘটনা ঘটল। দোলনী ম্যাগনেটোমিটার যন্ত্রটি সুব্রতকে ধরতে দিয়েছিলাম। সারাটা পথ ও বেশ যত্ন করেই যন্ত্রটিকে কোলে নিয়ে বসে ছিল। কিন্তু হঠাৎই উঁচু-নিচু পথে গাড়ি আচমকা ঝাঁকুনি দেওয়ায় যন্ত্রের কাচের তৈরি ভঙ্গুর অংশটি ভেঙে গেল। বিক্ষেপী ম্যাগনেটোমিটারের মতো এই যন্ত্রটি ততটা শক্তপোক্ত নয়। ফলে যে-আশঙ্কা বরাবর ছিল তাই সত্যি হল। কলকাতা থেকে জিপ না এলে, বাসে চড়ে যদি আমি ও ডক্টর সেনগুপ্ত হারাঙ্গাজাও উপত্যকায় আসার চেষ্টা করতাম তাহলেও হয়তো এই দুর্ঘটনাই ঘটত। কিন্তু জিপ এল, অথচ—। একেই বোধহয় বলে পোড়া কপাল! এখন আর কোনও উপায় নেই। শুধু বিক্ষেপী ম্যাগনেটোমিটার নিয়েই মাপজোখের কাজ সারতে হবে। পুরনো পরীক্ষা-নিরীক্ষার কিছু ফলাফল ব্যবহার করলে হারাঙ্গাজাও উপত্যকার ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের মান নির্ণয় করা যাবে—যদিও সেই মান ততটা নির্ভুল হবে না।

গন্তব্যে পৌঁছে চোখ জুড়িয়ে গেল জাটিঙ্গা নদীর রূপ দেখে। বর্ষায় বর্ষায় টইটম্বুর একটা সেতু পার হয়ে আমরা নদীর ওপারে গেলাম। নদীর প্রস্থ নেহাত কম নয়। প্রায় গঙ্গার আধাআধি হবে হয়তো। দু-পাড়ে ছোট-বড় পাথরের টুকরো। পাড়ের কাছে অগভীর জলে স্নানার্থীরা স্নান করছে। অবশ্য পাহাড়ী নদী যখন, তার গভীরতা নিশ্চয়ই বেশি নয়। তবে ওপর থেকে দেখে সে-ধারণা করা বেশ মুশকিল। শীতকালে এই ভরপুর নদীই আবার ক্ষীণস্রোতা হয়ে যায়।

এমনিতে হারাঙ্গাজাও হাফলঙের মতোই উপনগর। কিন্তু তার সৌন্দর্য কম নয়। দূরে পাহাড়, বনাঞ্চল, আর সামনে সমতল চাষজমির অন্তরঙ্গ হয়ে বয়ে যাওয়া ঢলঢল নদী—ঈশ্বর যেন এই অপূর্ব নিসর্গদৃশ্য নিজের হাতে তিল তিল করে তৈরি করে দিয়েছেন। নিজেকে আরও একবার

সৌভাগ্যবান বলে মনে হল। যন্ত্র ভেঙে যাওয়ার আক্ষেপ আর মনে রইল না।

কাজ সেরে আমরা জাটিঙ্গায় ফিরলাম বেলা পৌনে তিনটের সময়। ফেরার পথে একটা সবুজ লাউডগা সাপকে রাস্তা পার হতে দেখেছি। গত ক'-দিনের বর্ষা অনেককেই ঘরছাড়া করেছে। যেমন, কাল পয়েন্টের কাছাকাছি একটি মরা কেঁচো রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখেছিলাম। ঘটনাটা উল্লেখযোগ্য হত না যদি না কেঁচোটা লম্বায় প্রায় দু-ফুট হত, আর তার দেহ মোটা হত আমাদের হাতের আঙুলের মতো। মানুষ ছাড়া অন্য প্রাণীও তাহলে পাহাড়ী জলবাতাসে স্বাস্থ্যবান হয়ে উঠতে পারে! কলকাতায় যে-সব শীর্ণ কেঁচোদের দেখেছি তাদের জন্য তখন রীতিমতো দুঃখ হয়েছিল। এছাড়া তিন নম্বর টাওয়ারে আলোর টানে উড়ে আসা প্রকাণ্ড মথও দেখেছি। তাদের এক-একটি ডানা হাতের চেটোর মাপের চেয়েও বড়। শুনে তো দূরের কথা, স্বচক্ষে দেখেও বিশ্বাস হতে চায় না।

ডক্টর সেনগুপ্ত এক নম্বর টাওয়ারে নেমে গেলেও আমি জিপের সঙ্গে চলে গেলাম হাফলঙে। সেখানে গেস্ট-হাউসের ঘর থেকে ব্যক্তিগত জিনিসপত্র যা নেওয়ার নিয়ে গেলাম পাখির খাঁচার কাছে। চড়ুইপাখি ও দোয়েলগুলো চোখে পড়লেও খাঁচার গাছপালার ভিতরে পিট্টা পাখিটাকে দেখতে পেলাম না।

মিস্টার অধিকারীর সঙ্গে দেখা করার দরকার ছিল। তাই গেলাম বনবিভাগের দপ্তরে। কিন্তু চারটে বেজে যাওয়ায় অফিস ছুটি হয়ে গেছে। মিস্টার অধিকারী বলেছিলেন একটা স্টোরেজ ব্যাটারির ব্যবস্থা করে দেবেন। ব্যাটারির অভাবে আমাদের তড়িৎ-চুম্বকের পরীক্ষা মুলতুবি রয়ে গেছে এখনও। অবশ্য পরে তিনি ব্যাটারির ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। তাছাড়া অনেক মুশকিলই আসান করে দিয়েছেন। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ নিতান্ত কম নয়।

শেয়ারের ট্যাক্সিতে পাঁচ টাকা ভাড়া দিয়ে হাফলঙ থেকে জাটিঙ্গা ফিরলাম। জিপে একজন খাসিয়া যুবকের সঙ্গে আলাপ হল। আমাকে দেখেই সে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কি সেনগুপ্তের সঙ্গে এসেছ?'

বললাম, 'হ্যাঁ—'

তখন সে বলল যে, সে জাটিঙ্গা বার্ড-ওয়াচিং ক্লাবের সদস্য।

এই বার্ড-ওয়াচিং ক্লাব সম্পর্কে দু-চারটে কথা বলার আছে।

বছর কয়েক আগে, মূলত প্রাক্তন ডি এফ ও-র আগ্রহ ও উৎসাহে

জাটিঙ্গায় বার্ড-ওয়াচিং ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়। এই ক্লাবের উদ্দেশ্য ছিল পাখি সম্পর্কে গ্রামের মানুষজনকে সচেতন ও আগ্রহী করে তোলা, যাতে মরসুমের সময়ে পাখিদের নির্বিচারে হত্যার ব্যাপারটা বন্ধ হয়। বহু কিশোর-কিশোরী ও তরুণ-তরুণী এই ক্লাবের সদস্য। কিন্তু তাদের পরিচালনার জন্য উপযুক্ত শিক্ষকের ভীষণ অভাব। ডক্টর সেনগুপ্ত যখনই জাটিঙ্গায় এসেছেন তখনই বার্ড-ওয়াচিং ক্লাবের আগ্রহী সদস্যদের আগ্রহ নিবৃত্ত করেছেন, বিজ্ঞানসম্মত উপদেশ দিয়েছেন। কিন্তু তাঁর অনুপস্থিতিতে 'বার্ড-ওয়াচিং' ব্যাপারটি নিছকই 'পাখি দেখা' হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমাদের টাওয়ারে পোর্টম্যান্টোর ভেতরে মূল্যবান একজোড়া মাইক্রোস্কোপ ও তার আনুষঙ্গিক দামি যন্ত্রপাতি দেখেছি। স্রেফ অব্যবহারে জিনিসগুলো নষ্ট হতে বসেছে। তাছাড়া আগ্রহী মানুষজনকে যন্ত্রের ব্যবহার শেখাবেই বা কে! ডক্টর সেনগুপ্ত আমাকে ও আকোন্তাকে জটিল মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার দেখিয়েছেন। দেখিয়েছেন গাছের পাতা, মথের ডানার সূক্ষ্ম অংশ, আরও কত কী।

এইসব যন্ত্রপাতি ও বুকশেল্‌ফের চমৎকার বইগুলো বার্ড ক্লাবের সদস্যরা নিয়মিত ব্যবহার করলে সেটা বাৎসরিক সেমিনারের চেয়ে অনেক বেশি কাজের হত—অন্তত আমার সে-রকমই ধারণা।

বার্ড ক্লাবের সদস্যটির কাছ থেকেই শুনলাম, গত পঁচিশ তারিখ রাতে একটা ধবধবে সাদা ছোট্ট মাছরাঙা পাওয়া গেছে গ্রামে। বর্ণনা শুনে মনে হল, থ্রি-টোড কিংফিশার, তবে অ্যালবিনো—সাদা কাক বা সাদা ইঁদুরের মতো। না, পাখিটা এখন আর পাওয়া যাবে না। কারণ তার ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেছে ধরা পড়ার পরই। আরও শুনলাম, বড় মাপের সারসজাতীয় পাখিও এসেছে এবার। বর্ণনা শুনে বুঝতে পারলাম না কী পাখি, তবে ঠিক করলাম খবরগুলো ডক্টর সেনগুপ্তকে জানাব।

জিপ সবাইকে নামিয়ে দিল মূর্তির কাছে।

আকাশে চাঁদ রয়েছে। সেই সঙ্গে ঘন কুয়াশা। ফলে চাঁদের আলো ঝাপসা হয়ে ছড়িয়ে গেছে সবদিকে। আজ ফেনোমেননের কোনও আশা নেই। কালই পূর্ণিমা।

সঙ্গে টর্চ ছিল না। অগত্যা ঝাপসা জ্যোৎস্নায় পিচের রাস্তা ধরে হাঁটতে শুরু করলাম। দু-পাশের পাহাড় বা ঝোপঝাড় সব ঘন কালো ছায়ার মতো। রাস্তায় লোকজন নেই, পথচলতি গাড়িও চোখে পড়ছে না।

তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে হাঁটছি। পথ যেন আর ফুরোয় না। হঠাৎ দেখি

সামনে খানিকটা দূরে রাস্তার ওপরে একটুকরো ঘন কালো ছায়া।

থমকে দাঁড়ালাম। একটু ভয়ও পেলাম। কী ওটা? কোনও প্রাণী, না আমার দৃষ্টিভ্রম? রাস্তার ধারে গিয়ে হাতড়ে হাতড়ে এক টুকরো পাথর তুলে নিয়ে ছুড়ে মারলাম। সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ করলাম, মোটাসোটা কালো ছায়াটা আস্তে আস্তে সরে যেতে লাগল রাস্তার ধারের জঙ্গলের দিকে। তারপর ঢুকে পড়ল অন্ধকার ঝোপের মধ্যে।

সাত-তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে জায়গাটা পেরিয়ে গেলাম। ওটা কী পশু কে জানে। জাটিঙ্গায় অনেক বেওয়ারিশ কুকুর দেখেছি, তবে তাদের কখনওই এত মোটাসোটা মনে হয়নি। পরে এ-ঘটনার কথা শুনে ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, '.....হয়তো বুনো শুয়োর হবে।' আর পাখির খবরাখবর শুনে তিনি বেশ আক্ষেপ করলেন। বললেন, 'পাখিগুলো মরে যাওয়ার আগে যদি একবার আমাকে দেখাত, তাহলে ছবি তুলে নিতাম। শোনা কথা তো আর প্রমাণ নয়! এইভাবে কত দুষ্প্রাপ্য দামি পাখি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে কে জানে!'

খাওয়া-দাওয়া সেরে টাওয়ারে ফেরার পথে ঠিক হল, আগামীকাল মাপজোখের কাজ করতে আমরা মাহুরে যাব।

পরদিন ২৮ তারিখ, শনিবার, পূর্ণিমা। সকাল থেকেই আকাশ পরিষ্কার। হাফলঙ থেকে জিপ আসতেই আমরা রওনা হয়ে পড়লাম। অনুপ, সুব্রত, তারক, তিনজনেই আক্ষেপ করছিল ফেনোমেনন দেখতে পেল না বলে। পঁচিশ তারিখ রাতে জাটিঙ্গায় চলে এলে ওদের সেটা দেখার সৌভাগ্য হত। ডক্টর সেনগুপ্ত বললেন, ফেনোমেনন যা হওয়ার এবারের মতো হয়ে গেছে।

মাহুর যাওয়ার পথে তেইশ কিলোমিটার রাস্তার অনেকটাই ঘন জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে। শুনলাম, রাতে এ-পথে নাকি হাতি নেমে পড়ে। কলকাতা থেকে আসার সময়ে এই পথ ধরেই সুব্রতরা এসেছে। তবে রাতে শ্রীঘোষ গাড়ি চালাননি। আমাদের সন্ধের আগে ফিরতে হবে, তাই গাড়ি বেশ জোরেই চলছিল। হঠাৎ দেখি একটা খঞ্জন পাখি ঢেউ খেলানো ভঙ্গিতে উড়ে চলেছে। সাদা-কালো পাখি, অনেকটা দোয়েলের মতো দেখতে। ইংরেজি নাম লার্জ পাইড ওয়াগটেইল (বৈজ্ঞানিক নাম : *motacilla Maderaspatensis*)।

পাখিটা ঠিক আমাদের জিপের আগে আগে উড়ে যাচ্ছিল—যেন দৌড়

কম্পিটিশান হচ্ছে জিপের সঙ্গে। চালক মিস্টার ঘোষ গাড়ির গতিবেগ ক্রমশ বাড়াতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাখিটাও নিশ্চয়ই তার গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছিল, কারণ সে আগের মতোই আমাদের গাড়ির সামনে উড়ে যেতে লাগল। আমি ওডোমিটারের কাঁটার দিকে দেখছিলাম। গতিবেগ ঘণ্টায় পঁয়ত্রিশ কিলোমিটারের ঘরে পৌঁছতেই পাখিটা হেরে গেল। কারণ সে উড়তে উড়তেই পাশ ছেড়ে দিল আমাদের গাড়িকে—যেমন করে একটা গাড়ি অন্য গাড়িকে ওভারটেক করার জন্য পাশ ছেড়ে দেয়। খঞ্জন পাখির এই কাণ্ড আমাদের হাসিখুশি করে দিল।

পথে যেতে যেতে খাদের দিকে অনেক চাষজমি নজরে পড়ল। পাহাড়ের ঢালে সিঁড়ির ধাপের মতো সমতল জমির ফিতে ক্রমশ নেমে গেছে। সেখানে বলদ নিয়ে দিব্যি চাষ হচ্ছে। আবার যেখানে জঙ্গল তো জঙ্গল।

ভালো-খারাপ নানারকম রাস্তা পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম মাহুরে। এও হারাঙ্গাজাও হাফলঙের মতো আধা-শহর, তবে সৌন্দর্য তাদের মতো নয়। যথেষ্ট লোকজন চোখে পড়ছিল। ডক্টর সেনগুপ্তের কাছে শুনলাম, এখানে বেশিরভাগই কাছাড়ী। তাদের একটা জিনিস বেশ অদ্ভুতরকম দেখলামঃ চাদরে বাঁধা ছোট্ট ছোট্ট বাচ্চা সামনে কোমরের কাছে ঝুলছে। জাটিঙ্গা বা হাফলঙে উপজাতিদের দেখেছি রঙিন চাদরে বাচ্চা বেঁধে নেয় পিঠে। দার্জিলিঙে নেপালীদের মধ্যেও এ রকম দৃশ্য চোখে পড়ে। কিন্তু সামনে বাচ্চা বেঁধে নেওয়ার ধরনটা আমার এই প্রথম চোখে পড়ল। পরিবেশ ও জীবনযাত্রাই বোধহয় ওদের এই নতুন রীতির জন্য দায়ী।

মাহুর থেকে ফিরে আমরা নেমে পড়লাম টাওয়ারে, আর বাকিরা চলে গেল হাফলঙে। ঠিক হল, আগামীকাল আমরা লোয়ার হাফলঙ স্টেশনে যাব। সেখানে মাপজোখের কাজ শেষ হলেই আমাদের এবারের অভিযানের কাজে ইতি পড়বে। তারপর শুধু ৪ তারিখের সেমিনারের অপেক্ষা এবং তারপর বাড়ি ফেরা। কাজ যতই শেষ হয়ে আসছিল ততই বাড়ির জন্য মন কেমন করছিল। সত্যি, কলকাতাকে কতদিন যে দেখিনি!

জাটিঙ্গার বিভিন্ন জায়গায় মাপজোখের ভিত্তিতে ভূচুম্বকত্বের অনুভূমিক উপাংশের যে-সব মান পাওয়া গেছে তার একটি তালিকা নীচে দেওয়া হলঃ

স্থান	ভূচুম্বকত্বের অনুভূমিক উপাংশের মান (আরস্টেড)
চার্চ কম্পাউন্ড	০.৩৪২১
এক নম্বর টাওয়ার	০.৩৩১১
পয়েন্ট	০.৩৩৬১
ইউ. এল. সুচ্যাঙের মূর্তির কাছে	০.৩৪২৪
জাটিঙ্গা রেল স্টেশন	০.৩৪৪৯
ডুলং নদীর পাড়ে	০.৩৪১১
গ্রামের সর্বোচ্চ জায়গায়	০.৩৪০৫
হারাঙ্গাজাও উপত্যকা	০.৩৩৫৫
মাহুর	০.৩৫৬৮
লোয়ার হাফলঙ রেল স্টেশন	০.৩৫০৩

সন্ধেবেলা পূর্ণচন্দ্রের উদয় দেখতে দেখতে মনটা আবারও কেমন করে উঠল। মাউন্ট হেম্পিওর ওপিঠ থেকে থালার মতো প্রকাণ্ড চাঁদ উঠল কালো আকাশে। আর ফুটফুটে আলোয় ভেসে গেল জঙ্গল-পাহাড়-সমতলভূমি। 'মরি মরি' রূপ সে-জ্যোৎস্নার। মনে হল, আজকের রাতটার জন্যই বোধহয় আমি এতদিন ধরে অপেক্ষা করেছি। এরকম একটা চাঁদ আকাশে থাকলে কোন পাখিটাই বা হ্যাজাকের আকর্ষণে আসবে! জ্যোৎস্নাভাসি রাতে আমরা পায়ে হেঁটে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম আঁকাবাঁকা পথে। কাল থেকেই কৃষ্ণপক্ষ শুরু হবে ভেবে মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

সেদিন রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আগে বাড়ির কথা মনে পড়ছিল বারবার।

নয়

রবিবার সকালে থ্রি-টোড কিংফিশারটা মারা গেল। পাখিটা ইতিমধ্যেই বেশ নির্জীব হয়ে পড়েছিল। ঠিক হল, লোয়ার হাফলঙ যাওয়ার পথে পাখিটার মৃতদেহে হাফলঙের গেস্ট-হাউসে খাঁটি অ্যালকোহলে ডুবিয়ে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ডক্টর সেনগুপ্তের ফিল্ড ল্যাবরেটরিতে এ-সব ব্যবস্থা রয়েছে।

লোয়ার হাফলঙের মাপজোখ শেষ হলে স্টেশনে গিয়ে ৬ তারিখের

টিকিট কেটে নিলাম। ৬ তারিখে ট্রেনে চড়লে গুয়াহাটিতে ট্রেন বদল করে ৮ তারিখেই পৌঁছে যাব হাওড়া স্টেশনে। টিকিট হাতে পেয়ে মনটা বেশ খুশি হয়ে উঠল।

যন্ত্রপাতি গুছিয়ে ফেরার পথে একটা দোকান থেকে স্টোরেজ ব্যাটারি ভাড়া নিলাম। মিস্টার অধিকারী আগেই লোক মারফত খবর দিয়ে ব্যাটারি পাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাই করে রেখেছিলেন। সেই ব্যাটারি টাওয়ারে নিয়ে এসে ডাহুক পাখির ওপরে তড়িৎ-চুম্বকের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করেছিলাম। তড়িৎ-চুম্বকের তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা বাড়িয়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাখিটার মধ্যে প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা গেল। ডক্টর সেনগুপ্ত খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করে কী সব নোট করলেন। তাঁকে দেখে মনে হয়েছিল আমাদের পরীক্ষা একেবারে ব্যর্থ হয়নি।

পড়ন্ত বিকেলে আমরা সবাই মিলে গেলাম জাটিঙ্গা রেল স্টেশনের দিকে। মিস্টার ঘোষ জিপ নিয়ে মূর্তির কাছে অপেক্ষায় রইলেন। বরাইল শৈলশ্রেণীর কয়েকটি স্কেচ প্রয়োজন ছিল ডক্টর সেনগুপ্তের। সুব্রত কাঁচা পথ ছেড়ে ঝোপঝাড়ের ফাঁক দিয়ে ঢালের দিকে কিছুটা নেমে গিয়ে ছবি আঁকতে লাগল। কথা ছিল, সেখানে মিস্ট নেট টাঙিয়ে কিছু পাখিও সংগ্রহ করা হবে। তাই অনুপ ও তারক সেসব সরঞ্জাম সঙ্গে নিয়ে এসেছে। নেট টাঙানোর অ্যালুমিনিয়াম রডগুলো ভরা ছিল স্ট্র্যাপ লাগানো কাপড়ের খাপে। অনুপ সেটা কাঁধে ঝুলিয়ে ঘুরছিল। জনৈক খাসিয়া ভদ্রলোক সেটাকে বন্দুক ভেবে ওকে সন্দিহানভাবে নানান প্রশ্ন করতে লাগলেন। অনুপ প্রথমটায় ভড়কে গিয়েছিল। সাত-তাড়াতাড়ি সরে এসেছিল আমাদের কাছে। কিন্তু ভদ্রলোককে আমরা সব বুঝিয়ে বলতেই তিনি হেসে চলে গেলেন।

অন্ধকার হয়ে আসায় নেট টাঙিয়ে আর পাখি সংগ্রহ করা হয়নি। তবে একটি ছোট জোঁক সুব্রতর পা কামড়ে বসে ছিল। হেঁটে মূর্তির কাছে ফিরে আসার পর পা চুলকোতে গিয়ে সুব্রত ব্যাপারটা টের পায়। কালো জোঁকটিতে ছাড়িয়ে পায়ে পিষে মেরে ফেলা হল তৎক্ষণাৎ। এই খবর শুনে ঘোষ বললেন, 'আগেই জানতাম এখানে জোঁক আছে। আমি আর গাড়ি ছেড়ে নামছি না।'

কাজের শেষে ওরা আবার হাফলঙ চলে গেল, আর আমরাও ফিরে এলাম টাওয়ারে।

পাখিগুলোর মধ্যে ডাহুক ও ইয়েলো বিটার্ন সতেজ থাকলেও ব্ল্যাক

বিটার্ন-এর অবস্থা খুব ভালো নয়। নিয়মিতভাবে খাবার উগরে দেওয়ার ফলে ওটার সাপের মতো লম্বা গলার সঞ্চিত চর্বি ক্রমশই কমে আসছে। এখন অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে হাড়ের ওপরে চামড়া জড়ানো বলা যায়। দিনরাত মুখ তুলে বকের মতো লম্বা ঠোঁটটিকে ঊর্ধ্বমুখী করে চুপটি করে বসে থাকে পাখিটা। জলার ধারে বসে ছোঁ মেরে জ্যান্ত মাছ খাওয়া যার অভ্যেস তাকে বোধহয় জোর করে দুধ-চিনি খাওয়ানো যায় না। তাই পয়লা অক্টোবর সকালে পাখিটাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল হাফলঙের পাখির খাঁচায়। ওটাকে বুককেস থেকে বের করে গাড়িতে তোলার সময়ে সামান্য সুযোগ পেয়ে পাখিটা আচমকা ছোঁ মারে ডক্টর সেনগুপ্তের মুখ লক্ষ্য করে। কপাল ভালো সে আঘাত চোখে লাগেনি। নইলে পাখিটার যা ধারালো ঠোঁট! তার ওপর ঠোঁটে আবার করাতের দাঁতের মতো সূক্ষ্ম খাঁজ কাটা রয়েছে। এই 'সাঁড়াশির' মাঝে পড়লে পাঁকাল মাছেরও পালানোর সাধ্যি হবে না।

কিন্তু এত চেষ্টা সত্ত্বেও পাখিটা বাঁচেনি। ৪ তারিখ সকালে হাফলঙে গিয়ে আমরা খাঁচায় ওটার মৃতদেহ আবিষ্কার করেছি।

পয়লা তারিখ বিকেলে বাকি পাখি দুটোকেও ছেড়ে দেওয়া হল। খানিকটা তামার তার নিয়ে পাখি দুটোর উরুতে জড়িয়ে দিলেন ডক্টর সেনগুপ্ত। অর্থাৎ 'আংটি' পরিয়ে পাখিকে চিহ্নিত করে দেওয়া আর কি! যেভাবে পরিযায়ী পাখির গতিপথ বা গতিবিধির হদিস করা হয়। ডক্টর সেনগুপ্ত দেখতে চান এই পাখি দুটো আলোর আকর্ষণে আবার কোনওদিন ধরা পড়ে কি না।

তামার তার জড়ানোর পর বারান্দায় নিয়ে এসে প্রথমে ডাহুকটাকে উড়িয়ে দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি খাসিয়া বালক 'সিম! সিম!' চিৎকার করতে করতে ধেয়ে গেল উড়ন্ত পাখিটার পিছনে। 'সিম' মানে ওদের ভাষায় পাখি। কে জানে, ডাহুকটা শেষ পর্যন্ত ওদের হাত এড়াতে পেরেছে কি না!

ইয়েলো বিটার্নটাকে আমরা আর বারান্দা থেকে ছাড়লাম না। যদি ওটাও ধরা পড়ে ছেলেদের হাতে! খিড়কি দরজা খুলে স্নানের চৌবাচ্চার কাছে এসে ওটাকে উড়িয়ে দিলাম। সুষম ছন্দে ডানা নেড়ে জলার পাখিটা দিব্যি উড়ে গেল। উড়তে উড়তে একসময় অদৃশ্য হয়ে গেল গভীর জঙ্গলে।

পাখি দুটোর নিয়তি যদি আলোয় লেখা থাকে তাহলে মরার আগে বারেবারেই ওরা হয়তো উড়ে আসবে আলোর কাছে। শ্যামাপোকা বা

মথ যে কেন আলোর টানে উড়ে আসে তার কারণ এখনও জানা যায়নি। তেমনি এই পাখিদের উড়ে আসার নিশ্চিত কারণ পুরোপুরি কবে জানা যাবে কে বলতে পারে!

এই অদ্ভুত পাখিদের সম্পর্কে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন আজও ঘুরে বেড়ায় আমার মনে। যেমন,

১. বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কেন এই ঘটনা ঘটে?
২. এই ঘটনায় ঘন কুয়াশা ও বাতাসের ভূমিকা কী?
৩. ঝিরঝিরে বৃষ্টি কেন উড়ে আসা পাখির সংখ্যা বাড়িয়ে দেয়?
৪. পাখিরা কেন একটা নির্দিষ্ট এলাকাতেই ছুটে আসে—কেন তার বাইরে যায় না?
৫. আলোর কাছে এসে 'পড়ার' পর পাখিগুলো কেন সম্মোহিতের মতো আচরণ করে?
৬. সেই অবস্থায় স্বাভাবিক খাবার এনে দিলেও তারা খায় না কেন?
৭. কেন শালিক, বলবুলি, চড়ুই, এসব পাখি আলোর টানে উড়ে আসে না?

দুঃখের বিষয়, এই সব প্রশ্নের নির্ভুল উত্তর এখনও পাওয়া যায়নি।

সেদিন সন্ধ্যায় আমরা হাফলঙে গিয়েছিলাম। ডক্টর সেনগুপ্তের একটা জরুরি ট্রাঙ্ক কল আসার ছিল। অপেক্ষা করে করে ট্রাঙ্ক লাইন তো পাওয়াই গেল না উপরন্তু আমাদের সকলকে নিগৃহীত হতে হল উচ্ছৃঙ্খল মাতাল একদল কাছাড়ী যুবকের হাতে। ঘটনা আরও কতটা গড়াত জানি না, তবে ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি মিস্টার থাওসেন তৎপরভাবে হস্তক্ষেপ করায় অবস্থা আয়ত্তে আসে। ডক্টর সেনগুপ্তের কাছেই শুনলাম, দলের নেতা 'মন্টু' নামধারী কাছাড়ী যুবকটি প্রাক্তন কোনও এক প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পুত্র। শুনে বেশ অবাক হয়েছিলাম।

সেদিন রাতে টাওয়ারে ফিরতে ফিরতে প্রায় বারোটা বেজে গিয়েছিল।

পরদিন সকাল আটটা নাগাদ জিপ নিয়ে সহকারীরা জাটিঙ্গায় এসে হাজির। নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় ওরা কলকাতা ফিরে যেতে চায়। ডক্টর সেনগুপ্ত অনেকরকমভাবে আশ্বাস দিয়েও ওদের মনে আস্থা জাগাতে পারলেন না। একটু পরেই ওরা রওনা হয়ে গেল। আমাদের কাজ যেহেতু শেষ, তাই সমস্ত মালপত্রই জিপে তুলে দিলাম। জিপের সুখ বেশিদিন আমাদের কপালে সইল না। সুতরাং এখন শুধু সেমিনারের অপেক্ষা।

৪ তারিখে সেমিনারের দিন জাটিঙ্গায় রীতিমতো উৎসব লেগে গেল।

ঠিক যেন কলকাতার দুর্গাপুজো। প্যাণ্ডেল, মাইক, আলো, খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা—সে এক এলাহী কাণ্ড!

জাটিঙ্গার পাখি নিয়ে আলোচনা-সভায় বেশ কয়েকজন গ্রামবাসী তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বললেন। তারই মধ্যে জাটিঙ্গাবাসী জনৈক স্কুলশিক্ষক মিস্টার রূপসির বক্তব্য ও আগ্রহ আমাকে মুগ্ধ করেছে। সব শুনে মনে হল জাটিঙ্গায় এমন একজন শিক্ষকের প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত প্রশিক্ষণ দিয়ে পাখি-গবেষণার বিষয়ে গ্রামবাসীদের শিক্ষিত ও সচেতন করে তুলবেন। শিক্ষাগত দিকটির এই দুর্বলতাটুকু ছাড়া আর সব দিক দিয়েই সেমিনার সফল বলা যায়। সুতরাং মিস্টার অধিকারীর কৃতিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই।

সন্ধেবেলা সেমিনারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শুরু হল। নাচ, গান, নাটক, কবিতা ছাড়াও জাটিঙ্গার পাখির ওপরে নির্মিত একটি তথ্যচিত্র দেখলাম। আরও দেখলাম বন্যপ্রাণী ও প্রকৃতি বিষয়ক একটি মনোগ্রাহী বিদেশী তথ্যচিত্র।

সেমিনারের দিন আলাপ হল স্কুলশিক্ষক মিস্টার রূপসির কন্যা সিলভিয়ার সঙ্গে। জাটিঙ্গা গ্রামে ছেলেদের চেয়ে মেয়েরাই পড়াশোনায় বেশি এগিয়ে। বর্তমানে গ্রামে মাত্র তিন-চারজন মহিলা গ্র্যাজুয়েট রয়েছে—তার মধ্যে ও একজন। এখন শিলং-এর বিশ্ববিদ্যালয়ে 'এডুকেশান' নিয়ে পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিগ্রি করছে। সিলভিয়া সত্যিই গ্রামের গর্ব।

খাওয়া-দাওয়া হইচই-এর মধ্যে দিয়ে সেমিনার শেষ হল অনেক রাতে। গ্রামের লোকদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল জাটিঙ্গাতেই। আর আমন্ত্রিত অতিথি ও বনবিভাগের অফিসারদের জন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল হাফলঙের গেস্ট-হাউসে। সেখান থেকে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। মিস্টার অধিকারী জিপের বন্দোবস্ত করে দিয়েছিলেন। ফেরার পথে বারবার মনে হচ্ছিল, আজই জাটিঙ্গায় আমার শেষ রাত। জিপের জানলা দিয়ে দেখলাম চাঁদ উঠেছে অনেক নীচে। এক এক জায়গায় পাহাড়ের আড়াল না থাকায় অনেক নীচে দিগন্তরেখা চোখে পড়ে আর সেই সঙ্গে চাঁদ। কুয়াশার টুকরো মাঝে মাঝে সেই চাঁদকে আবছা করে দিচ্ছে। আর নীচের অন্ধকার খাদে কুয়াশা জমে তৈরি হয়েছে এক আশ্চর্য নদী। যেন অফুরন্ত দুধ কেউ ঢেলে দিয়েছে শৈলমালার পাদদেশে।

সেদিন বিছানায় শুয়ে অনেক রাত পর্যন্ত জেগে ছিলাম। জাটিঙ্গার টুকরো টুকরো ঘটনাগুলো মনে পড়ছিল চলচ্চিত্রের মতো। কাল দুপুরে মিস্টার

অধিকারী জিপ পাঠিয়ে দেবেন আমাদের হাফলঙে নিয়ে যাওয়ার জন্য। তারপর জাটিঙ্গা ছেড়ে হাফলঙ, হাফলঙ থেকে গুয়াহাটি, গুয়াহাটি থেকে....।

পরদিন সকালে গিরিনের দোকানে গেলাম আমরা। রোজকার মতো চা-বিস্কুট খেলাম। পরে শেষবারের মতো দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সারলাম ওর বাড়িতে। ডক্টর সেনগুপ্ত যখন হিসেব মেটাচ্ছেন তখন গিরিন বলল, 'সার, আজ সকালের চা-বিস্কুটের দাম ধরি নাই। আমি খাওয়াইলাম। আপনারা আজ চলে যাবেন। আমরা ছোট মানুষ—এর বেশি আর কী করতে পারি....।'

ওর কথায় মনটা ভারি হয়ে গেল। ও জানে না, ওর চেয়ে বড় মানুষের দেখা পাওয়া খুব সহজ নয়।

জিপ এলে চাচাদের কাছে বিদায় নিলাম। বিদায় নিলাম আকোস্তা ও পহেলার কাছে। তারপর আঁকাবাঁকা পথ ধরে জিপ ছুটে চলল হাফলঙের দিকে।

দুপুরের ঝকঝকে রোদে বরাইল পাহাড়ের রেখা গাঢ় সবুজ, স্পষ্ট। দু-পাশের বাঁশগাছের জঙ্গল যেন মাথা ঝুঁকিয়ে রয়েছে পথের ওপরে। বাতাসে বাঁশপাতা ঝিরঝির করে দুলছে। আমার ক্রাইং উইলোর কথা মনে পড়ছিল। এক অভিনব বিষাদবোধ ঘিরে ধরছিল মনকে। প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিটি টুকরো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম। হয়তো এই শেষ দেখা। যদিও দ্বিতীয়বার কখনও এখানে আসি, তাহলে 'প্রথম দেখার' রোমাঞ্চ যে তাতে থাকবে না সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই আমার।

একইসঙ্গে মনে পড়ছিল রহস্যময় পাখিদের কথা। ওদের 'আত্মহত্যা'র কারণ আমরা খুঁজে পাইনি। কোনওদিন কি সত্যিই পাওয়া যাবে এই রহস্যের উত্তর? কে জানে!

জিপের চাকার তলায় পথ গড়িয়ে যাচ্ছিল। ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে বরাইল পাহাড়, সবুজ বন, আশ্চর্য পাখি, গিরিন, আকোস্তা, পহেলা, সবাই। ফিরে যাওয়ার আনন্দ ছেড়ে যাওয়ার দুঃখ[redacted] সেই মুহূর্তে ছাপিয়ে উঠতে পারছিল না।
